মাওলানা মুহাঃ ইউসুফ ইসলাহী

আসান ফিকাহ

(সংকলিত)

মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী

অনুবাদ ও সম্পাদনায় ঃ আব্বাস আলী খান

পরিবর্ধন ও পরিমার্জনে ঃ অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

প্রকাশনায় ঃ
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি
৭৩, আউটার সার্কুলার রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা -১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫১৩৬১

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৮৪ ইং

১৬তম মুদ্রন-

জানুয়ারী	ঃ	২০০৯ ঈসায়ী
মাগ	ঃ	১৪১৫ বাংলা
মহররম	ঃ	১৪৩০ হিজরী

কম্পিউটার কম্পোজ
কোবা এ্যাডভারটাইজিং এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ চাষীকল্যাণ ভবন, ওয়্যারলেস রেলগেট
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৯৩৩৫৯২৫

মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

মুদ্রণে ঃ
ইছামতি অফসেট প্রেস
১/১, হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৬২৫৯০

Asan Feqah written by Maolana Muhammad Yusuf Islahi.Translated by Abbas Ali Khan, Complied by Professor Md. Mosharraf Hossain and Published by Islamic Education Society.

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী জীবন-বিধান অনুসরণ করে চলতে হয়। কুরআন ও হাদীস থেকে সংগৃহিত মাসআলা জানা না থাকলে সত্যিকারভাবে ইসলামী জীবন-যাপন করা যায় না। ফিকাহর কিতাব থেকে এসব জ্ঞান আহরণ করা যায়। মাওলানা মোঃ ইউসুফ ইসলাহী রচিত ও মরহুম আব্বাস আলী খান অনুদিত 'আসান ফিকাহ' ফিকাহর জ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটি খন্ডে প্রকাশিত। প্রথম খন্ড থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ নিয়ে স্কুল-মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যোপযোগী করে একটি সংকলন ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি প্রকাশ করে নভেম্বর, ১৯৮৪ ঈসায়ী সনে। বইটির ১১তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ২০০৫ ঈসায়ী সালে।

বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন ও অন্যান্য পাঠক শ্রেণীর উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সংকলনটির ১২তম প্রকাশের সময় বর্ধিত আকারে প্রকাশ করা হলো। এতে মূল বই থেকে আরো বেশ কিছু অংশ সংযোজন এবং প্রয়োজনীয় অংশ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এ কাজটি সম্পাদন করেছেন সোসাইটির রিসার্চ স্কলার অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন এবং তাঁকে সহযোগিতা করেছেন মুহাম্মদ শামীমুল বারী। বইটি থেকে সর্বশ্রেণীর পাঠকমন্ডলী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

সংকলনটি প্রকাশের সাথে জড়িত ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ সবাইকে নেক জাযা দিন।

(অধ্যক্ষ) মুহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

আরকানে ইসলাম

যে কোন দালানকোঠা অথবা ঘরদোর হোক, তা অবশ্যই কোন ভিত্তি বা স্তম্ভের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। এ ঘরদোর ততোক্ষণ পর্যন্তই ঠিক থাকে, যতোক্ষণ তার ভিত্তি বা স্তম্ভ মজবুত থাকে। এ স্তম্ভ যদি নড়বড়ে হয়ে যায় অথবা দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে তার উপরের যে ঘর সেটাও দুর্বল হয়ে যায়। আর যদি সে স্তম্ভ গোড়া থেকেই নড়ে যায় অথবা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে যেতে চায়, তাহলে ঘরখানাও দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না এবং যে কোন সময়ে ধড়াস করে মাটিতে পড়ে যাবে। ইসলামের দৃষ্টান্ত ঠিক একটি ঘরের মত। এর পাঁচটি আরকান বা স্তম্ভ আছে। এগুলোকে ইসলামের আরকান বলে।

ইসলামী অট্টালিকা বা ঘরের এ সব স্তম্ভ যতোটা মজবুত হবে ইসলামী দালানটাও ততোটা স্থায়ী হবে। যদি আল্লাহ না করুন, এসব আরকান দুর্বল হয়, গোড়া আলগা হয়ে যায় অথবা পড়ে যাওয়ার মতন হয়, তাহলে ইসলামী দালানও ঠিক থাকতে পারবে না। ধড়াস করে এক সময়ে মাটির উপরে পড়ে যাবে।

এখন ইসলাম যদি আমাদের কাছে প্রিয় হয় এবং যদি আমরা এ ঘরের ছায়ায় থেকে নিশ্চিন্ত মনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এক আল্লাহর বন্দেগী করতে চাই এবং সেই সাথে এ মহৎ আকাংখাও পোষণ করি যে, আল্লাহর সকল বান্দাহ এ দালান ঘরে আশ্রয় নিয়ে কুফর ও শিরকের বিপদ থেকে দূরে থাকুক, আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হিসাবে জীবন যাপন করুক এবং দ্বীন ও দুনিয়ায় সাফল্য লাভ করুক। তাহলে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, আমাদেরকে আরকানে ইসলামের মর্মকথা ভালভাবে জানতে হবে এবং তার স্থায়িত্ব ও মজবুতির পুরোপুরি ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর কোন অবস্থাতেই তাকে দুর্বল হতে দেয়া যাবে না। তার কারণ এই যে, ইসলামের এ বিরাট দালান তার অসংখ্য বরকতসহ তখনই কায়েম থাকতে পারে যখন তার এসব স্তম্ভ মজবুত হয়ে বিদ্যমান থাকবে।

ইসলামের আরকান পাঁচটি

১। কালমায়ে তাইয়্যেবা অর্থাৎ কুফর ও শিরকের ধারণা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলামী আকায়িদের উপর ঈমান আনা।

২। নামায কায়েম করা।

৩। যাকাত আদায় করা।

৪। রমযানের রোযা রাখা।

৫। বায়তুল্লাহর হজ্জ করা।

নবী (সঃ) বলেন – بُنِيَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর।

شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ –

এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল।

وَاِقَامِ الصَّلٰوةَ — এবং নামায কায়েম করা

وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةَ — এবং যাকাত দেয়া

وَصَوْمِ رَمَضَانَ — এবং রমযানের রোযা রাখা

وَحَجِّ الْبَيْتِ — এবং আল্লাহর ঘরের যিয়ারত করা বা হজ্জ করা।

ইসলামী আকায়িদ ও চিন্তাধারা

নেক আমলের বুনিয়াদ

ইসলামের যাবতীয় ইবাদত ও নেক আমলের বুনিয়াদ হচ্ছে ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে কোন ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়, কোন নেকী কবুল হবার নয় এবং নাজাতও সম্ভব নয়। যে কোন আমল দেখতে যতোই নেক মনে হোক না কেন, ঈমান যদি তার বুনিয়াদ না হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে তার কোনই মর্যাদা হবে না, কোরআন সেই আমলকে নেক আমল বলে, যার প্রেরণার উৎস ঈমান।

আল্লাহ্ বলেন ঃ-

যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে, তা সে পুরুষ হোক অথবা নারী, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তার জন্যে আমি পূত পবিত্র জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দেব। – (সূরা নমল ঃ ৯৭)

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছ -

(হে রসূল) তাদেরকে বলুন তোমাদের কি বলে দেব কারা তাদের আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে অকৃতকার্য ও ব্যর্থ মনোরথ? তারা সেসব লোক যাদের সকল

চেষ্টা-চরিত্র দুনিয়ার জীবনে গোমরাহির মধ্যে ব্যয়িত হয়। অথচ তারা মনে করে যে, তারা নেক আমলই করছে। তারা ঐসব লোক যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর নিকটে হাজীর হওয়ার ব্যাপার বিশ্বাস করেনি। সে জন্যে তাদের সব আমল ব্যর্থ হয়েছে। কিয়ামতের দিনে সে সবের কোনই মূল্য হবে না। – (সূরা কাহাফ ঃ ১০৩-১০৫)

ঈমান বলতে কি বুঝায়?

কালেমায়ে তাইয়্যেবা এবং কালেমায়ে শাহাদাতের মর্ম অন্তর দিয়ে মেনে নিয়ে মুখে উচ্চারণ করাকেই বলে ঈমান।

কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ ঃ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهُ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল।

কালেমায়ে শাহাদাত ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দাহ এবং রাসূল।

কালেমায়ে তাইয়্যেবা এবং কালেমায়ে শাহাদাতের উপর ঈমান আনার পর যে সব বিষয়ের মোটামুটি স্বীকৃতি দিতে হয় তাকে বলা হয় ইসলামী আকায়িদ।

ইসলামী আকায়িদ ছয়টি[১] ঃ

১। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান।

২। ফেরেশতাদের উপর ঈমান।

৩। রসূলগণের প্রতি ঈমান (খতমে নবুয়তের প্রতি ঈমানসহ)।

৪। আসমানী কিতাব সমূহের উপর ঈমান।

৫। আখিরাতের উপর ঈমান।

৬। তাকদীরের উপর ঈমান।

---

১. ইসলাম শিক্ষা-৩ এ বর্ণিত 'ঈমান' অধ্যায়ের ঈমানে মুফাস্‌সালে ৭টি বিষয়ে ঈমান আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ৭ম বিষয় মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া এখানে ৫ম বিষয় আখিরাতে ঈমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ ছ'টি আকীদা প্রকৃতপক্ষে ঈমানের ছ'টি অংশ। এ সবের মধ্যে পারস্পরিক গভীর ও অনিবার্য সম্পর্ক আছে। এ সবের কোন একটিকে মেনে নিলে অন্য সব কয়টিকেই মেনে নিতে হয় এবং কোন একটিকে অস্বীকার করলে সবগুলোকেই অস্বীকার করা হয়। ঈমানের প্রকৃত অর্থ এই যে, এ সবগুলোকে অন্তর দিয়ে মেনে নেয়া। কেউ যদি এ সবের মধ্যে কোন একটি মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে কিছুতেই মুমিন বলা যাবে না। ঠিক তেমনি সে-ও মুমিন নয় যে ইসলামের এ ছ'টি আকীদার অতিরিক্ত কোন নতুন আকীদা নিজের পক্ষ থেকে ঈমানের অংশ বলে মনে করে এবং ঈমানের জন্য তা প্রয়োজনীয় মনে করে।

আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান

১। এই যে বিরাট বিশাল প্রকৃতি জগত, তার মধ্যে সৌরজগতের মত অসংখ্য জগৎ আছে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনাও আছে। এসব কত বিরাট বিশাল তা আমাদের কল্পণার অতীত। এ সব সৃষ্টি হঠাৎ করে ঘটনাচক্রে অস্তিত্ব লাভ করেনি। বহু বছর যাবত বস্তুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলও এসব সৃষ্টি নয়। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর আপন ইচ্ছায় ও নির্দেশে বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে এ সব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এ সবের প্রকৃত মালিক। তিনি তাঁর অসীম কুদরতে এ সব কায়েম রেখেছেন এবং যতো দিন ইচ্ছা কায়েম রাখবেন।

২। প্রকৃতির রাজ্যের প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালা। এমন কোন কিছু নেই যা তার দ্বারা সৃষ্টি না হয়ে আপনা আপনিই অস্তিত্বে এসেছে। প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব তাঁর উপর নির্ভরশীল। তিনিই সকলের প্রতিপালক। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে রক্ষা করেন এবং যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করেন।

৩। তিনি অনাদি কাল থেকে আছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন। তিনি চির জীবিত ও চির শাশ্বত। তাঁর ধ্বংস নেই।

৪। তিনি এক ও একক। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সর্ব শক্তিমান। কেউ তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে না। তাঁর পিতা-মাতাও নেই। সন্তান সন্তুতিও নেই। স্ত্রী, পুত্র-পরিজন, ভাই, বেরাদর, জাতি, গোষ্ঠি কিছুই নেই।

৫। তিনি সকল বিষয়ে লা-শরীক। তাঁর সত্তায় ও গুণাবলীতে অধিকার ও এখতিয়ারে কোন শরীক বা অংশীদার নেই। তিনি আপনা আপনি অস্তিত্ববান। তাঁর অধিকার ও ইখতিয়ারে, সত্তা ও গুণাবলীতে কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী তাঁকে হতে হয় না।

৬। কোন কিছুই তাঁর সাধ্যের অতীত নয়। এমন কোন বিষয়ের কল্পনা করা যেতে

পারে না যা করতে তিনি অক্ষম। সকল প্রকারের বাধ্যবাধকতা, অক্ষমতা ও দোষ ক্রটির উর্ধে তিনি। তিনি সকল মংগলের উৎস। যতো পবিত্র নাম ও উৎকৃষ্ট গুণাবলী তা সবই তাঁর জন্যে। নিদ্রা অথবা তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি পাক পবিত্র এবং সকল দোষ-ক্রটির উর্ধে।

৭। তিনি সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির একমাত্র বাদশাহ্ বা শাসক। সকল কর্তৃত্বের উৎস তিনি। বিশ্ব প্রকৃতিতে একমাত্র তাঁরই কর্তৃত্ব চলছে। তাঁর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি ব্যাতীত কর্তৃত্ব প্রভুত্ব আর কারো হতে পারে না তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করারও কেউ নেই।

৮। তিনিই সকল শক্তির আসল উৎস ও কেন্দ্র। অন্য সকল শক্তি তাঁর কাছে নগণ্য। বিশ্ব প্রকৃতিতে এমন কিছু নেই যা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে তা সে মানুষ হোক, ফেরেশতা অথবা জ্বীন হোক অথবা অন্য কোন শক্তিশালী সৃষ্টি হোক। প্রকৃতি রাজ্যের কোন বৃহত্তম গ্রহ অথবা দৃশ্য অদৃশ্য কোন শক্তি (Energy) তারা যতো বড়ো ও শক্তিশালী হোক– আল্লাহ্র অসীম কুদরত ও ক্ষমতার কাছে কিছুই না।

৯। তিনি সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান। তিনি সর্বদ্রষ্টা প্রত্যেকটি বস্তু তিনি দেখতে পান– তা সে ভূগর্ভে হোক অথবা অসীম আকাশের কোন স্থানে হোক। তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত। মানুষের মনের কথা, তার অন্তরের অন্তঃস্থলে লুক্কায়িত ভাবধারা ও আবেগ-অনুভূতি এবং সকল প্রকার গোপন রহস্য তাঁর পুরোপুরি জানা। তিনি মানুষের কাঁধের শিরা-উপশিরা থেকেও নিকটে অবস্থান করেন। তিনি পূর্বাপর সকল বিষয়ের সুনিশ্চিত জ্ঞান রাখেন। গাছ থেকে এমন কোন পাতা পড়ে না যা তাঁর জ্ঞানের বাইরে অথবা ভূখণ্ডে লুক্কায়িত এমন শস্যবীজ নেই যা তাঁর জানা নেই।

১০। জীবন মৃত্যু তাঁর হাতে। যাকে ইচ্ছা তাকে জীবন ও মৃত্যু দান করেন। যাকে তিনি মারতে চান তাকে রক্ষা করার কেউ নেই এবং যাকে তিনি জীবিত রাখতে চান তাকে কেউ মারতে পারে না।

১১। সকল সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। এ সম্পদ থেকে যাকে তিনি বঞ্চিত করতে চান, তাকে কেউ কিছু দিতে পারে না। যাকে তিনি দিতে চান, কেউ তা ঠেকাতে পারে না। কাউকে সন্তান দান করা না করা সম্পূর্ণ তাঁর ইখতিয়ারে। যাকে ইচ্ছা তাকে পুত্র সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা তাকে কন্যা

অথবা যাকে ইচ্ছা তাকে উভয়ই দেন। আবার যাকে ইচ্ছা তাকে উভয় থেকেই বঞ্চিত করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কারো এতটুকু ক্ষমতা নেই।

১২। লাভ-লোকসান একমাত্র তাঁর ইখতিয়ার! তিনি কাউকে ক্ষতি অথবা বিপদের সম্মুখীন করতে চাইলে কেউ তা ঠেকাতে পারে না। আর যদি তিনি কারো মংগল করতে চান, তাহলে কেউ তার কোন ক্ষতি বা অমংগল করতে পারে না। মোট কথা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ কারো কোন মংগল-অমংগল করতে পারে না।

১৩। একমাত্র তিনিই সকলের রিযিকদাতা। রিযিকের চাবিকাঠি একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনিই তাঁর যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। সকলকেই তিনি রুজি দান করেন। রুজি রোজগারের ব্যাপারে কমবেশী করাও তাঁর হাতে। যার জন্যে তিনি যতটুকু নির্ধারিত করে রেখেছেন, সে ততটুকুই ঠিক মতো পাবে। এর কমবেশী করার অধিকার কারো নেই।

১৪। তিনি অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ। তিনি বিজ্ঞ ও সুস্থ্ বিচার সম্পন্ন। তিনি সঠিক সিদ্ধান্তকারী। তিনি কোন হকদারের হক নষ্ট করেন না এবং কারো উপর জুলুম করেন না। এ তাঁর ন্যায়-নীতির খেলাপ যে সুকৃতিকারী এবং দুষ্কৃতিকারী তাঁর নিকটে সমান হবে। প্রত্যেককে তাঁর আপন আপন কৃতকর্ম অনুযায়ী তিনি প্রতিদান দেন। কোন অপরাধীকে তিনি তার অপরাধের অধিক শাস্তি দেন না এবং কোন নেক লোককে তার যথোপযুক্ত পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত করেন না। তাঁর একটি সিদ্ধান্ত তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান, সুস্থ্ বিচার বুদ্ধি ও ন্যায়ের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

১৫। তিনি তাঁর বান্দাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি গুনাহ্ মাফ করে দেন, তওবাকারীর তওবা কবুল করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের উপর সর্বদা রহমত বর্ষণ করে থাকেন। তাঁর রহমত ও মাগফিরাত থেকে মুমিনদেরকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

১৬। তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁকে ভালোবাসা যেতে পারে। একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। তাঁকে ব্যাতীত আর কাউকে ভালোবাসতে হলে তাঁরই জন্য ভালোবসতে হবে, তাঁর ভালোবাসাই সকল ভালবাসাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

১৭। একমাত্র তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার হকদার। সকল ইবাদত, দাসত্ব ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই। তিনি ব্যতীত অপর কেউ না

আনুগত্য লাভের অধিকারী হতে পারে আর না তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা যেতে পারে। একমাত্র তাঁর সামনেই সবিনয়ে দাঁড়ানো যেতে পারে। তাঁকেই সিজদা করা যেতে পারে। তাঁর কাছেই সব কিছু চাওয়া যেতে পারে। তাঁর কাছেই সবিনয়ে কাকুতি মিনতি করা যেতে পারে।

১৮। এ অধিকার একমাত্র তাঁর যে, মানুষ তাঁর আনুগত্য করবে। তাঁর আইন মেনে চলবে। নিরংকুশভাবে তাঁর নির্ধারিত শরীয়তের বিধান মেনে চলবে। হালাল হারাম নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র তাঁর। এ ব্যাপারে কারো কণামাত্রও অধিকার নেই।

১৯। একামাত্র তাঁকেই ভয় করতে হবে। তাঁর উপরেই আশা ভরসা রাখতে হবে। প্রতিটি ব্যাপারে সাহায্য তাঁর কাছেই চাইতে হবে। তাঁকেই বাসনা পূরণকারী, ত্রাণকর্তা অভিভাবক ও সাহায্যদাতা মনে করতে হবে। সকল ব্যাপারে নির্ভর তাঁর উপরেই করতে হবে।

২০। হেদায়েত তাঁর কাছেই চাইতে হবে। সুপথ দেখানো তাঁর কাজ। তিনি যাকে হেদায়েত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সুপথে আনতে পারে না।

২১। কুফর, শিরক, নাস্তিকতা, বিদআত প্রভৃতি ইহকাল ও পরকালের জন্য ধ্বংস নিয়ে আসে। দুনিয়ার মধ্যে নিকৃষ্ট মানুষ তারাই যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাঁর দ্বীন কবুল করে না, তাঁর সাথে অন্যকে অংশীদার বানায় এবং তার আনুগত্য করার পরিবর্তে আপন প্রবৃত্তির আনুগত্য করে।

২২। কুফরী অবস্থায় যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের উপর আল্লাহর লানৎ, ফেরেশতাদের লানৎ এবং সমগ্র মানবজাতির লানৎ।

২৩। কুফরী ও শিরকের পরিনাম আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং তার ফলে অনন্তকাল শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে।

২৪। শিরক সুস্পষ্ট জুলুম ও মিথ্যা। অন্যান্য সকল গোনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু শিরকের গোনাহ্ কিছুতেই মাফ করবেন না।

তাকদীরের উপর ঈমান

তাকদীরের উপর ঈমান, বলতে গেলে আল্লাহ্ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমানেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ জন্য কোরআনে তার উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য হাদীসে এর গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে একে ইসলামের স্থায়ী আকীদাহ্ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

তাকদীরের উপর ঈমানের প্রকৃত অর্থ এই যে, বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু ভালো ও মন্দ আছে অথবা ভবিষ্যতে হবে, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং সবই তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ভালোমন্দের কোন সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম দিকও তাঁর জ্ঞানের বহির্ভুত নয়। তাঁর জ্ঞান প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। মানুষ দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করে ভালো কাজ করবে, না মন্দকাজ করবে, তা তার জন্মের পূর্ব থেকেই আল্লাহর জানা আছে। বিশ্ব প্রকৃতির কোন অণুপরমাণু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গতিশীল ও ক্রিয়াশীল হতে পারে না, আর না কোন সূক্ষ্ম বস্তুরও কার্যক্রম বা গতিশীলতা তাঁর জ্ঞানের বাইরে থাকতে পারে। আল্লাহ যার জন্যে যা কিছু লিখে রেখেছেন, তা খণ্ডন করার এতটুকু শক্তি কারো নেই। তিনি কাউকে কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করে থাকলে তা দেবার ক্ষমতাও কারো নেই। ভালোমন্দ ভাগ্য নির্ধারণ একমাত্র তাঁরই হাতে এবং মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তাঁর পূর্ব নির্ধারিত।[১]

নবী পাক (সঃ) এর এরশাদ –

كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (مسلم)

আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি-জগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন। তিনি বলেন, তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর। অর্থাৎ পানি ব্যতীত কোন সৃষ্টিই তখন ছিল না। – (মুসলিম)

ফেরেশতাদের উপর ঈমান

১। ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার এক অনুগত সৃষ্টি। এ নূরের পয়দা এ আমাদের

১। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার বুকে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে তার সীমিত পরিমণ্ডলে ভালোমন্দ কাজ করার যে স্বাধীনতা বা ইখতিয়ার দিয়েছেন, তাঁর সবকিছু জানা থাকলেও সে ইখতিয়ার ক্ষুণ্ন করা হয় না। দ্বীন ইসলামের শিক্ষা এই যে, মানুষ যেন সর্বদা নেক আমল করতে থাকে এবং দ্বীনের আনুগত্যের ব্যাপারে অবহেলা না করে। তাকদীর প্রসঙ্গটি নিয়ে মাথা ঘামানো এবং তার জটিল তথ্যানুসন্ধান থেকে বিরত থাকতে হবে। শুধু এতটুকু মনে রাখতে হবে যে, নেক আমলকারী মুমিনের জন্যে আল্লাহ বেহেশত তৈরী করে রেখেছেন এবং দুষ্কৃতিকারীদের জন্যে জাহান্নাম। ঈমান এনে যদি আমি নেক আমল করি, তাহলে আমি বেহেশতের হকদার হব। আর কাফের হয়ে মন্দ কাজ করি তাহলে আমাকে জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে।

দৃষ্টি বহির্ভূত। তাঁরা নারীও নন, পুরুষও নন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন। সে কাজই তাঁরা করে যাচ্ছেন।

২। ফেরেশতাগণ আপন মর্জি মত কিছু করেন না। আল্লাহর শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রভুত্বেও তাঁদের কণামাত্র অধিকার নেই। তাঁরা আল্লাহর রাজ্যের ইখতিয়ার বিহীন প্রজা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে যে আদেশ করা হয়, তা দীধাহীন চিত্তে পালন করার কাজেই তাঁরা লেগে যান। তাঁদের এমন সাধ্য নেই যে, আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কিছু করেন।

৩। তাঁরা হরহামেশা আল্লাহর প্রশংসা করে থাকেন। না তাঁরা আল্লাহর কোন আদেশ লংঘন করেন, আর না তাঁরা আল্লাহর সার্বক্ষণিক প্রশংসাতে ক্লান্তিবোধ করেন। দিনরাত নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাঁরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেন।

৪। ফেরেশতাগণ সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। আল্লাহর নাফরমানি অথবা বিদ্রোহের ধারণাও তাঁরা করতে পারেন না।

৫। যে কাজে তাঁরা নিয়োজিত তা পরিপূর্ণ দায়িত্ব সহকারে সমাধা করেন। কর্তব্যে কোন অবহেলা প্রদর্শন অথবা কাজে ফাঁকি দেয়ার তাঁদের কোন মনোভাব থাকে না।

৬। তাঁদের সংখ্যা কত তা আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন। তবে চারজন অতি প্রসিদ্ধ এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভকারী। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

ক) হযরত জিবরাইল (আঃ)। তাঁর কাজ ছিল আল্লাহর কিতাব ও পয়গাম নবীগণের নিকট পৌঁছানো। সে কাজ তার শেষ হয়েছে। এজন্য যে নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ছিলেন সর্বশেষ নবী।

খ) হযরত ইসরাফিল (আঃ)। ইনি কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে সিংগায় ফুক দেবেন।

গ) হযরত মিকাইল (আঃ)। বৃষ্টি বর্ষণ ও আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রতি রিজিক পৌছানোর দায়িত্ব তাঁর উপর।

ঘ) হযরত আযরাইল (আঃ)। তিনি প্রতিটি সৃষ্টি জীবের জীবন হরণের কাজে নিয়োজিত।

৭। দু'জন করে ফেরেশতা প্রত্যেক মানুষের সাথে থাকেন। একজন তার ভালো কাজ এবং অন্যজন তার মন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁদেরকে বলা হয় কিরামুন কাতেবীন- (সম্মানিত লেখকবৃন্দ)।

৮। দু'জন ফেরেশতা মানুষের মৃত্যুর পর তার কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাদেরকে বলা হয় 'মনকির' ও 'নাকির'।

রসূলগণের প্রতি ঈমান

১। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর হুকুম আহকাম ও হেদায়েত পৌঁছাবার জন্য যে ব্যবস্থা করেন তাকে 'রিসালাত' বলা হয়। যাঁরা মানুষের কাছে এ হিদায়েত এবং পয়গাম পৌঁছিয়ে দেন, তাদেরকে বলা হয় নবী, রসূল।

২। রসূল বা নবী আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে ঠিকমতো পৌঁছিয়ে দেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কোন খেয়ানত করেন না। না অতিরঞ্জিত করেন। না কিছু গোপন করেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি 'অহী' নাজিল হয়েছে। তা মানুষের কাছে পৌছাবার পুরোপুরি হক তাঁরা আদায় করেছেন।

৩। 'রিসালাত' আল্লাহর দান। যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। এ মর্যাদা মানুষের কোন ইচ্ছা অভিলাষ এবং কোন চেষ্টা চরিত্রের ফল নয়। এ আল্লাহ্র বিশেষ দান। তিনিই জানেন এ মহান খেদমত কার কাছ থেকে নেবেন এবং কিভাবে নেবেন।

৪। 'রসূল' অবশ্যই মানুষ হয়ে থাকেন। ফেরেশতা, জ্বিন অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এ মর্যাদা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্র উপরে তাদের কোন অধিকার অথবা প্রভাব থাকে না। তাঁদের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্ তাঁদেরকে তাঁর প্রতিনিধি এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য বেছে নেন। তাঁদের কাছে তিনি তাঁর 'অহী' পাঠান।

৫। যে জীবন বিধান বা 'দ্বীন' তিনি পেশ করেন, তা তিনি স্বয়ং পুরোপুরি মেনে চলেন এবং তিনি তাঁর দাওয়াতের আদর্শ বা নমুনা হয়ে থাকেন। তাঁর এ কাজ নয় যে, তিনি অন্যকে দ্বীনের আনুগত্যের দাওয়াত দেবেন এবং স্বয়ং তা থেকে দূরে থাকবেন।

৬। প্রত্যেক যুগে নবী এসেছেন। প্রত্যেক জাতির জন্য এসেছেন, প্রত্যেক দেশে এসেছেন। মুসলমান সব নবীর উপর ঈমান আনে। কারো নবুয়তকে অস্বীকার করে না। যেসব নবী রসূলগণের উল্লেখ কোরআন ও হাদীসে আছে মুসলমান তাদের প্রতি ঈমানের স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। কিন্তু যাদের উল্লেখ কোরআন হাদীসে নেই, তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে। না তাদের নবী হওয়ার কথা স্বীকার করে, আর না তাদের সম্পর্কে এমন কোন উক্তি করে যার দ্বারা তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়।

৭। প্রত্যেক নবীর দাওয়াত একই ছিল। তাঁদের কোন এক জনকে অস্বীকার করলে সকলকে অস্বীকার করা বুঝায়। তাঁরা সকলে একই দলভুক্ত ছিলেন এবং সকলে একই বাণী নিয়ে এসেছেন।

৮। নবীর উপর ঈমান আনার অর্থ এই যে, তাঁর পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে। নবীর আনুগত্য করা না হলে শুধু মৌখিক নবী বলে স্বীকার করলে তা হবে একেবারে অর্থহীন।

৯। নবী মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত এসে নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী রাসূল আসবেন না। সে জন্য তিনি 'খাতামুন নাবিয়ীন'। তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য এবং যতোদিন দুনিয়া থাকবে, ততোদিনের জন্যে তাঁর নবুয়ত থাকবে। আল্লাহর কাছে তারাই নাজাত পাবে যারা তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর আনুগত্যের ভিতরেই জীবন যাপন করবে।

১০। আমাদের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আদর্শ নবী মুহাম্মদ (সঃ) -এর জীবন। দীনের ব্যাপারে তাঁর হুকুমই চূড়ান্ত। মুসলমানের কাজ হচ্ছে এই যে, যে কাজের নির্দেশ তাঁর পক্ষ থেকে এসেছে তা মনপ্রাণ দিয়ে পালন করতে হবে। যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। মোট কথা তাঁর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত মাথা পেতে মেনে নিতে হবে।

১১। রসূলের আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য। রসূলের নাফরমানি তেমনি আল্লাহরই নাফরমানি হবে। আল্লাহর মহব্বতের তাকিদেই রসূলের আনুগত্য, এই হচ্ছে ঈমানের কষ্টিপাথর। রসূলের নাফরমানী মুনাফেকির আলামত।

১২। রসূলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ঈমানের পরিচায়ক। তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা ও বেয়াদবি যাবতীয় নেক আমল বরবাদ করে দেয়। মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হলো রসূলকে তার মা-বাপ, সন্তানাদি ও আত্মীয়-স্বজন থেকেই শুধু অধিকতর প্রিয় মনে করবে না, বরং তার নিজের জীবন অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় মনে করবে।

১৩। রিসালাতের উপর ঈমানের সুস্পষ্ট দাবী হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক মুসলমান নবী মুস্তফা (সঃ) -এর উপর দরূদ পড়বে এবং তাঁর জন্যে দোয়া করবে।

আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান

১। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের হিদায়েতের জন্য ছোট বড়ো বহু কিতাব নাযিল

করেছেন। এ সব কিতাবে তিনি দ্বীনের কথা বলেছেন এবং জীবন পরিচালনার জন্যে বিধানও দিয়েছেন। নবীগণ এ সব কিতাবের মর্মকথা সুস্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং নিজে আমল করে দেখিয়েছেন।

২। সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনতে হবে। কারণ এসব কিতাবের বুনিয়াদী শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ বলা হয়েছে আল্লাহর বন্দেগী কর এবং কুফর ও শিরক থেকে দূরে থাক।

৩। আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে চারটি প্রসিদ্ধ যা চারজন প্রখ্যাত পয়গাম্বরের উপর নাজিল করা হয়েছিল। যথা ঃ-

ক) তাওরাত ঃ এ কিতাব নাযিল হয়েছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর।

খ) যবুর ঃ এ কিতাব নাযিল হয়েছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর।

গ) ইঞ্জিল ঃ এ কিতাব নাযিল হয়েছিল হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর।

ঘ) কোরআন মজিদ ঃ এ কিতাব নাজিল হয়েছিল সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর উপর।

৪। আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র কুরআন মজিদ তার আসল রূপ ও আকৃতিতে, তার প্রতিটি আসল শব্দ ও অক্ষরসহ অবিকল বিদ্যমান আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ স্বয়ং তার সংরক্ষণের ওয়াদা করেছেন। কিছু জালেম পাপাচারী যদি (নাউযু বিল্লাহ) কুরআনের সকল সংখ্যা জ্বালিয়ে ফেলে তথাপিও তা সংরক্ষিত থাকবে। তার কারণ এই যে, সকল যুগে সকল দেশে এমন কোটি কোটি মুসলমান ছিল, আছে এবং থাকবে যাদের বক্ষে কুরআন অবিকল সংরক্ষিত ছিল, আছে এবং থাকবে।

৫। অন্য তিনটি আসমানী কিতাবের বহুলাংশ পরিবর্তন করা হয়েছে। তার কোনটি এখন তার আসল রূপে বিদ্যমান নেই। প্রথমতঃ এ কিতাবগুলো যে সব নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার অনেক পরে সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত ঃ পথভ্রষ্ট ও দুনিয়ার স্বার্থ শিকারী লোকেরা এসব কিতাবে বর্ণিত শিক্ষার সাথে এমন কিছু সংযোজিত করেছে যা দ্বীনের বুনিয়াদী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এমন সব বিষয় ছাঁটাই করেছে যা ছিল তাদের স্বার্থের পরিপন্থী। এ জন্য আজকাল আল্লাহর প্রকৃত দীন জানবার এবং তার উপর আমল করার একটিমাত্র সংরক্ষিত, নির্ভরযোগ্য ও সর্বজন গৃহীত উপায় রয়েছে এবং তা হচ্ছে কুরআন মজিদ। তাকে অস্বীকার করে এবং তার মুখাপেক্ষী না হয়ে কেউই আল্লাহর

সত্যিকার দীনের আনুগত্য করতে পারে না। কিয়ামাত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী মানব জাতির উচিৎ এ কিতাবের উপর ঈমান আনা। তার উপর ঈমান আনা ব্যতীত নাজাত কিছুতেই সম্ভব নয়।

৬। কুরআন পাকের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অধিকার কারো নেই। নবীর কাজও শুধু এই ছিল যে, তিনি ঠিক মতো তা মেনে চলতেন। কুরআন পাক থেকে নিজের মন মতো অর্থ বের করা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা তার আয়াতসমূহকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা নেহায়েৎ বেদীন লোকের কাজ।

৭। কুরআনে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান আছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যার সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট হিদায়েত দেয়া হয়নি। এ জন্য জীবনের কোন এক ক্ষেত্রে কুরআন থেকে বেপরোয়া হওয়া এবং তার দেয়া মূলনীতির মুকাবিলায় অন্য মূলনীতি অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলা পথভ্রষ্টতা এবং কুরআনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।

আখিরাতের উপর ঈমান

১। মানুষের জীবন শুধু এ দুনিয়ার জীবনই নয়। বরঞ্চ মরণের পর পুনর্জীবন লাভ করার পর এক দ্বিতীয় জীবন শুরু হবে যা হবে চিরন্তনের জীবন এবং যার পর মৃত্যু আর কাউকে স্পর্শ করবে না। এ জীবন আপন আপন কর্ম অনুযায়ী অত্যন্ত সুখের হবে অথবা অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের। এ জীবনের উপর বিশ্বাসকেই বলে আখিরাতের উপর বিশ্বাস।

২। মরণের পর প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির নিকট 'মনকির' ও 'নাকীর' ফেরেশতাদ্বয় এসে জিজ্ঞাসা করবেনঃ-

* বল তোমার রব কে?
* বল তোমার দ্বীন কি?
* নবী মুস্তাফা (সঃ) -কে দেখিয়ে বলবেন– বল ইনি কে?

এই হচ্ছে আখিরাতের পরীক্ষার প্রথম ঘাঁটি।

৩। একদিন যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। পৃথিবী ভয়ংকরভাবে এবং থর থর করে কাঁপতে থাকবে। সূর্য-চন্দ্রের মধ্যে সংঘর্ষ হবে। তারকারাজি আলোকবিহীন অবস্থায় চারদিকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। পাহাড় পর্বত ধুনানো তুলার মতো উড়তে থাকবে। আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রকার জীব মৃত্যুবরণ করবে এবং গোটা বিশ্বজগত সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪। অতঃপর আল্লাহর আদেশে দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুক দেয়া হবে। তখন সকল মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করবে। এক নতুন জগত অস্তিত্ব লাভ করবে। এবার মানুষের জীবন হবে চিরন্তনের জীবন। একেই বলে কিয়ামতের দিন এবং এ দিনটি হবে অত্যন্ত ভয়ংকর। ভয় ও ত্রাসে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হতে থাকবে। দৃষ্টি থাকবে নীচের দিকে। প্রত্যেকে তার পরিণামের প্রতীক্ষা করবে।

৫। সকল মানুষ হাশরের ময়দানে আল্লাহর সম্মুখে একত্র হবে। আল্লাহ বিচারের আসনে সমাসীন হবেন। সেদিন সকল কর্তৃত্ব প্রভুত্ব একমাত্র তাঁরই হবে। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কারো মুখ খুলবার সাহস হবে না। আল্লাহ প্রত্যেকের পৃথক পৃথকভাবে হিসাব নেবেন। তিনি তাঁর জ্ঞান, সুস্থ বিচার বুদ্ধি ও ন্যায় পরায়ণতার ভিত্তিতে সঠিক ফায়সালা করবেন। প্রত্যেককে তার সঠিক ও ন্যায় সংগত প্রতিদান দেয়া হবে। কারো প্রতি কণামাত্র অবিচার করা হবে না।

৬। নেক বান্দাহদের ডান হাতে এবং পাপীদের বাম হাতে তাদের নামায়ে আমল দেয়া হবে। নেক লোকেরা নাজাত ও সাফল্য লাভ করবেন এবং পাপাচারীরা ব্যর্থ মনোরথ হবে। সাফল্য লাভকারীদের মুখমণ্ডল আনন্দে সমুজ্জল হবে। পক্ষান্তরে পাপাচারীদের মুখমণ্ডল দুঃখ-বেদনায় মলীন ও কালো হবে। নেক ও ধার্মিক লোকেরা বেহেশতে আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি লাভ করবেন এবং আল্লাহদ্রোহীদেরকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

৭। সেদিনের সিদ্ধান্ত হবে অনড় ও অপরিবর্তনীয়। এ সিদ্ধান্ত কেউ এড়াতে পারবে না। মিথ্যা কথা বলে অথবা কোন বাহানা করে কেউ আল্লাহকে প্রতারিত করতে পারবে না, আর না কোন অলী অথবা কোন নবী কারো অন্যায় সুপারিশ করবেন। শাফায়াত বা সুপারিশের জন্যে একমাত্র তিনি মুখ-খুলতে পারবেন যাকে আল্লাহ অনুমতি দেবেন। একমাত্র তারই জন্য সুপারিশ করা হবে যার জন্য আল্লাহ সুপারিশের অনুমতি দেবেন। দ্বিতীয় বার দুনিয়ায় আসারও সুযোগ কারো হবে না যাতে করে সে নেক আমল করে আখিরাতের জীবন সার্থক করবে। কারো ক্রন্দন ও বিলাপও কাউকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।

৮। দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের আমল সংরক্ষিত করা হচ্ছে। আমরা যা কিছুই বলছি এবং করছি তা সবই আল্লাহর ফিরেশতাগণ লিখে রাখছেন। মুখ থেকে

কোনো কথা বেরুবার সাথে সাথেই ফিরেশতা তা অবিকল সংরক্ষিত করে রাখছেন।

৯। মানুষের কোন আমলই সেদিন আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না। তা সে সরিষা পরিমাণ হোক, কঠিন পাথরের মধ্যে প্রোথিত হোক, আকাশে বাতাসে হোক অথবা ভূগর্ভের কোন অন্ধকার স্তরে লুক্কায়িত হোক, আল্লাহ সেদিন তা এনে হাজির করবেন। প্রত্যেকেই সেদিন আল্লাহর সামনে ধরা পড়বে।

১০। জান্নাতবাসী মুমিনদেরকে এমন অনুপম ও অফুরন্ত সুখ-সম্পদ দান করা হবে যে, যা চোখ কোন দিন দেখিনি, কান এ সম্পর্কে কিছুই শুনেনি এবং অন্তর তা কোনদিন কল্পনাও করেনি। যেদিকেই তাঁরা যাবেন, চারদিক থেকে 'সালাম, সালাম, খোশ আমদেদ, খোশ আমদেদ' ধ্বনীই শুধু শোনা যাবে। এ আনন্দ-সুখ থেকে তাঁদেরকে কোনদিন বঞ্চিত করা হবে না। তাঁদের সব চেয়ে বড় পাওয়া হবে এই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর দীদার দান করবেন এবং বলবেন, হে আমার বান্দাগণ। আজ আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তোষ প্রকাশ করছি। এখন আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি নারাজ হবো না।

১১। আল্লাহদ্রোহীদেরকে জাহান্নামের দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। আগুন তাদেরকে ঘিরে রাখবে এবং সেখান থেকে কোনদিন তারা পালাতে পারবে না। তারা মরেও যাবে না যে যন্ত্রণা থেকে নিস্কৃতি পাবে। আর তারা জীবিত থাকবে জীবন উপভোগ করার জন্য। নৈরাশ্যে প্রতি মুহূর্তে তারা মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু মৃত্যু তাদের কপালে আর ঘটবে না। জাহান্নামের আগুন রাগে ফেটে পড়তে থাকবে এবং কখনো নিভে যাবে না। পিপাসা কাতর হয়ে যখন জাহান্নামবাসী ছটফট করবে, তখন তাদেরকে উত্তপ্ত গলিত ধাতু পানীয় হিসাবে দেয়া হবে। যার ফলে মুখ পুড়ে যাবে। অথবা এমন জিনিস দেয়া হবে যা গলদেশ পার হতে পারবে না। তাদের গলায় আগুনের হাঁসুলি এবং আলকাতরা ও আগুনের পোশাক পরানো হবে। ক্ষুধায় তাদেরকে কন্টকযুক্ত খাদ্য খেতে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ থাকবেন।

১২। কে বেহেশতবাসী এবং কে জাহান্নামবাসী তার সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার রয়েছে। অবশ্যি যে কাজগুলো একজন মানুষকে বেহেশতে নিয়ে যাবে তা নবী করীম (সঃ) সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে যে কাজগুলোর পরিণাম জাহান্নাম তাও সুস্পষ্ট করে তিনি বলে দিয়েছেন। দুনিয়ায় আমরা

কাউকে নিশ্চয়তার সাথে বেহেশতী বলতে পারি না। অবশ্যি ঐ সব ভাগ্যবান ব্যতীত যাদেরকে নবী পাক (সঃ) বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু ভালো নিদর্শন দেখে আল্লাহর রহমতের আশা অবশ্যই করা যেতে পারে।

১৩। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে যে কোন গোনাহ্ মাফ করে দিতে পারেন। কুরআন বলে আল্লাহ্ কুফর ও শিরকের গোনাহ্ মাফ করবেন না। তবে খাটি দিলে তওবা করলে তিনি মাফ করবেন। –(সূরায়ে ফুরকান) ।

১৪। জীবনের যে কোন সময়ে ঈমান আনলে অথবা গুণাহ্ থেকে তওবা করলে তার ঈমান এবং তওবা আল্লাহ্ কবুল করেন। মৃত্যুর সময় যখন আযাবের ফেরেশতা দেখা যায় তখন না কারো ঈমান কুবল হবে, না তওবা।

অনৈসলামী আকায়িদ ও চিন্তাধারা

মুসলমান হওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হয়ে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তার উপর ঈমান এনে তার ভিত্তিতেই জীবনকে সংশোধিত করে গড়ে তুলতে হবে। ঠিক তদানুরূপ এটাও প্রয়োজন যে ইসলাম ও ঈমানের অনৈসলামী আকীদাহ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কেও পূর্ণ অবহিত হতে হবে। এ সব আকীদাহ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে মন মস্তিষ্ক মুক্ত ও পবিত্র করতে না পারলে ইসলামের দাবী পূরণ ও সত্যিকার ইসলামী জীবন-যাপন কিছুতেই সম্ভব নয়।

নিম্নে সংক্ষেপে সেসব ইসলাম বিরোধী ধারণা-বিশ্বাসের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা থেকে একজন মুসলমান পূর্ণ অনুভূতি সহকারে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখতে হয়।

১ । কুফরী চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড পছন্দ করা, এতে গর্ববোধ করা এবং অপরকেও এ জন্যে উদ্বুদ্ধ করা ঈমানের সম্পূর্ণ খেলাপ। এসব থেকে অতি সত্তর তওবা করতে হবে।

২। দীন ইসলামের আমল আখলাকে এবং তার নিদর্শনাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা। ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, অবজ্ঞা ও ঘৃণা সহকারে এ সবের উল্লেখ করা ইসলামের প্রতি অতি নির্লজ্জ উক্তি এবং নিকৃষ্ট ধরনের মুনাফেকী। এ ধরনের কথাবার্তা বরদাশত করা, কথা ও কাজের দ্বারা এ সবের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ না করা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করা হয়। দীনের প্রতি আনুগত্যহীনতা প্রকাশ করা হয় এবং এর দ্বারা ঈমানের চরম দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়।

৩। আল্লাহ ও তাঁর নবী পাক (সঃ)-এর নিদর্শনাবলী অবগত হওয়ার পরেও বাপ-দাদার প্রথা এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালনে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালনকে অবমাননাকর মনে করা ইসলাম বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ফল। ঈমানের সাথে এসবের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই।

৪। আল্লাহ ও রসূলের হুকুম আহকাম নিজের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করা, তার অর্থ বিকৃত করে আপন স্বার্থের অনুকূল করা এবং আল্লাহ ও রসূলের আদেশ–নিষেধগুলো হুবহু পালন করা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা চরম মুনাফেকী।

৫। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম-আহকামের সমালোচনা করা, তার মধ্যে ত্রুটি বের করা, সময়োপযোগী নয় মনে করা, এ ধরনের উক্তি করা যে এসব অন্ধযুগের কাজ কারবার। এসব কিছুই ভ্রান্ত চিন্তাধারার ফলশ্রুতি যার সাথে ঈমানের কোন সম্পর্ক নেই।

৬। আল্লাহতে অবিশ্বাসীরা হালাল-হারামের বাছ-বিচার না করে ধন-সম্পদ উপার্জন করে এবং আনন্দমুখর জীবন যাপন করে। এসব দেখে কোন মুসলমান যদি তার ঈমান সম্পর্কে লজ্জাবোধ করে এবং বলে আহা! যদি মুসলমান না হতাম তাহলে আমরাও দুনিয়াকে উপভোগ করতে পারতাম, তাহলে এসব চিন্তা ধারণা ও উক্তি ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারারই ফল বলতে হবে। এসব থেকে ঈমানকে রক্ষা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৭। শরীয়তের বাধা-নিষেধকে উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা মনে করা, মহিলাদেরকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পুরুষের কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে কাজ করাতে গর্ববোধ করা, ঘরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরকে পরস্পরের সাথে হাত মিলাতে, নিঃসংকোচ গল্প-আলাপ করতে ও সম্পর্ক স্থাপন করতে দেখে গর্ববোধ করা এবং এটাকেই প্রগতি মনে করা নির্লজ্জ ধরনের ধর্মহীনতা। এটা আত্মমর্যাদা এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের সম্পূর্ণ খেলাপ।

৮। দীনি শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণের ঔদাসীন্য, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতায় শুধু নিশ্চিত থাকা নয়। অজ্ঞতার কারণেই ইসলামের উপর আমল না করার জন্য অক্ষমতা প্রকাশ ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিন্তাধারা যা একজন মুসলমানের ঈমান-আকীদাহ নষ্ট করে দেয়।

৯। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে লাভ লোকসান, সম্মান-অসম্মান, উন্নতি-অবনতি প্রভৃতির মালিক মোখতার মনে করা, তৌহীদি বিশ্বাসের বিপরীত।

১০। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য অন্তরে ভীতি পোষণ করা, কারো উপরে ভরসা করা, কারো উপরে আশা পোষণ করা মানব জীবনের উত্থান-পতনের এখতিয়ার অন্য কারো আছে বলে বিশ্বাস করা ঈমানকে বিনষ্ট করে।

১১। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, কার্যসম্পাদনকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ দূরকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী, সাহায্যদাতা ও রক্ষাকর্তা মনে করা তৌহিদি আকীদার বিপরীত।

১২। ভবিষ্যত সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা এবং তা বিশ্বাস করায় ঈমান নষ্ট হয়।

১৩। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে হাযির-নাযির মনে করা যে, গোপন এবং প্রকাশ্য সব তার জানা আছে বিশ্বাস করা ইসলামী আকীদার খেলাপ।

১৪। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে ডাকা, কারো রুজি ও সন্তানাদি চাওয়া, কারো নামে সন্তানের নাক-কান ছিদ্র করা, চুলের ঝুটি রাখা, কারো নামে মানত মানা পরিপূর্ণ শিরক।

১৫। আল্লাহ ছাড়া কারো নামে পশু ছেড়ে দেয়া, পশু জবেহ করা, সন্তান বাঁচার জন্য বেদআতি কাজ করা, নবপ্রসুত সন্তানকে রক্ষা করার জন্য তার শিয়রে কোন অস্ত্র রাখা, সন্তানের জীবনের জন্য অন্য কোন শক্তিকে ভয় করা প্রভৃতি শিরক এবং তৌহীদের বিপরীত।

১৬। বিয়ে-শাদী, সন্তানের জন্ম ও খাৎনার সময় এমন সব কাজ অপরিহার্য মনে করা যা ইসলাম অপরিহার্য মনে করে নি, এগুলো ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা ও কুসংস্কার।

১৭। রোগ ও মৃত্যুর জন্য আল্লাহর উপর দোষারোপ করা, অসংগত ও গোস্তাখিপূর্ণ উক্তি করা, আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা ঈমান বিনষ্টকারী কাজ।

১৮। আসাধারণ বিপদ-আপদে পতিত হয়ে এবং বার বার বিপদ ও বিভিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রত্যাশা না করা এবং (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহকে দয়ামায়াহীন মনে করা কুফরী চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। এ ধরনের শয়তানি অসঅসা মনের মধ্যে প্রকাশ পেলে সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি দিলে তওবা করা উচিৎ।

১৯। কারো সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো, কাউকে সিজদা করা, কারো সামনে মস্তক অবনত করা শিরক।

২০। কবরে চুমো দেয়া, তার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো, কবরে কপাল ঠেকানো এবং এ ধরনের আর যতসব কর্মকাণ্ড সবই তৌহীদি আকীদার পরিপন্থী এবং চরম অবমাননা।

২১। কোন পীরের ছবি বরকতের জন্য কাছে রাখা, তাতে ফুলের মালা পরানো এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন পুরোপুরি শিরক।

২২। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং এমন বিশ্বাসের ঘোষণা করা যে অবস্থার পরিবর্তন করার ক্ষমতা তার আছে– একেবারে শিরক।[১]

২৩। কারো আদেশ-নিষেধকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সমতুল্য মনে করা, তার নির্দেশকে অগ্রাধিকার দেয়া, শরীয়তের বিধানগুলোতে কমবেশী করার অন্য কারো অধিকার আছে বলে মনে করা, কাউকে শরীয়তের উর্ধে মনে করা অথবা কাউকে এমন মনে করা যে শরীয়তের কোন বিধান সে মাফ করে দিতে পারে– এগুলো শিরক।

২৪। কারো বাড়ী এবং কবরের তওয়াফ করা, কোন স্থানকে কা'বা শরীফের মতো মনে করে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ইসলাম বিরোধী আকীদারই বহিঃপ্রকাশ।

২৫। আলী বখশ, নবী বখশ, হোসেন বখশ, আবদুন্নবী প্রভৃতি নাম রাখা এবং কাউকে ইয়া গউসুল মদদ, ইয়া অলীউল মদদ প্রভৃতি নাম ধরে ডাকা তৌহীদি আকীদার খেলাপ।

২৬। আল্লাহর আইনের তুলনায় মানুষের তৈরী আইন সঠিক মনে করা তা মেনে চলা অপরিহার্য মনে করা, তা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা সাধনা করা, তার সমর্থক ও সাহায্যকারী হওয়া ঈমান ও ইসলামী চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত।

২৭। আখিরাতে নাজাতের জন্যে ঈমান ও আমলের পরিবর্তে পীর 'অলী'র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাকে যথেষ্ট মনে করা এবং এমন মনে করা যে, তাঁর সুপারিশে সব কিছু হয়ে যাবে। অথবা আল্লাহর উপর তিনি এতোখানি প্রভাব খাটাতে পারেন যে, যেমন খুশী তেমন সিদ্ধান্ত করাতে পারেন– একেবারে ইসলাম বিরোধী আকীদাহ-বিশ্বাস।

২৮। নিজেকে পাপ অথবা পূণ্য করতে একেবারে বাধ্য মনে করা এবং মনে করা যে, বান্দার ভালোমন্দ করার কোনই অধিকার নেই, ভালোমন্দ সবই আল্লাহ

১। কোন মৃত ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যেতে তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্যে গাড়ী বা যানবাহন থামানো এবং সেই মৃত ব্যক্তি দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে পারে বলে তার কবরে কিছু নযর নিয়ায দেয়া, না দিলে নারাজ হয়ে কোন বিপদে ফেলতে পারেন বলে বিশ্বাস করা ষোল আনা শিরক। – অনুবাদক

করান এবং বান্দাহ বাধ্য হয়েই তা করে এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ধারণা-বিশ্বাস-এ বিশ্বাসসহ আখিরাতের উপর বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে পড়ে।

২৯। নিজেকে সকল কাজ করতে পরিপূর্ণ সক্ষম মনে করা এবং এমন মনে করা যে, মানুষ যা কিছু করে তাতে আল্লাহর করার কিছুই নেই, প্রত্যেক কাজ করার পূর্ণ এখতিয়য়ার মানুষের আছে এটা ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা। এমন চিন্তাধারা থেকে অন্তরকে পাক-পবিত্র রাখা দরকার।

৩০। নবী-রসূলগণকে নিষ্পাপ মনে না করা, কোন মন্দ কাজ তাদের প্রতি আরোপ করা অথবা তাঁদেরকে আসমানী কিতাবের প্রণেতা মনে করা ইসলাম বিরোধী আকীদাহ-বিশ্বাস।

৩১। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)- এর সমালোচনা করা, তাঁদের দোষ ক্রটি বের করা, তাঁদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা অথবা তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা। এসব চিন্তাধারা থেকে তওবা করা উচিত।

৩২। আল্লাহ ও তাঁর রসূল দীন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এখন কাশ্‌ফ ও ইলহামের মাধ্যমে অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিতে দীন সম্পর্কে নতুন কিছু আবিষ্কার করা, তা চালু করাও তা প্রয়োজনীয় মনে করা বিদ্‌আত। আর বিদ্‌আত বড়ো গোনাহ এবং গোমরাহী।

৩৩। বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে পড়ে নিজের ভাগ্যকে ভালোমন্দ বলা, তাকদীরের বিরুদ্ধে উক্তি করা এবং এ ধরনের কথা বলা– কি বলব, আমার তকদীর মন্দ, আল্লাহ আমার কপালে এই রেখে ছিলেন, আমার ভাগ্য কি এমন যে সুখের মুখ দেখবো না– এ ধরনের উক্তি করায় আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা হয় এবং তাঁর শানে গোস্তাখি করা হয়। এ ধরনের ইসলাম বিরোধী ধারণা ও উক্তি থেকে নিজেকে পাক রাখা দরকার। আল্লাহর প্রত্যেকটি কাজে সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া প্রকৃত ঈমানের আলামত।

তাহারাত (পবিত্রতা)

নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত হবার পর দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নবী মুস্তাফা (সঃ)-এর উপর প্রথম যে অহী নাযিল হয় তাতে তাওহীদের শিক্ষার পরই এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা (তাহারাত) অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ –

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (المدثر : ٤)

নিজেকে পাক পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন (মুদ্দাসসির-৪) । ثِيَاب শব্দটি ثَوْب শব্দের বহুবচন। যার শাব্দিক অর্থ পোশাক। কিন্তু এখানে ثِيَابٌ (সিয়াব) বলতে শুধুমাত্র পোশাক-পরিচ্ছদ বুঝানো হয় নি। বরং শরীর, পোশাক, মন-মস্তিষ্ক মোট কথা সমগ্র ব্যক্তিত্বকে বুঝানো হয়েছে। আরবী ভাষায় طَاهِرُالثَّوْب ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মলিনতার উর্ধ্বে। কুরআনের এ নির্দেশের মর্ম হলো নিজের পোশাক, শরীর ও মন-মস্তিষ্ককে সকল প্রকার মলিনতা থেকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে হবে। মন-মস্তিষ্কের মলিনতার অর্থ শিরক -কুফরের ভ্রান্ত মতবাদ ও চিন্তাধারা এবং চরিত্রের উপর তার প্রতিফলন। শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের মলিনতার অর্থ এমন অপবিত্রতা যা অনুভব করা যায় এবং রুচি প্রকৃতির কাছে ঘৃণ্য। অতঃপর শরীয়তও যার অপবিত্র (নাপাক) হওয়া ঘোষণা করেছে।

পবিত্রতার এ গুরুত্ব সামনে রেখে কুরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এর জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কুরআনের দু'স্থানে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন যে, যারা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে তারা তাঁর প্রিয় বান্দাহ।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (التوبه : ١٠٨)

– যারা পাকসাফ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। (তাওবা ঃ ১০৮)

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (البقرة : ٢٢٢)

যারা বার বার তওবা করে এবং পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। (বাকারা ঃ ২২২)

নবী পাক (সঃ) নিজে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন। উম্মতকে তিনি পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার জন্য বিশেষভাবে তাকীদ করেছেন এবং বিভিন্নভাবে তার গুরুত্ব বর্ণনা করে পাকসাফ থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

অতঃপর তিনি বিস্তারিতভাবেও সুস্পষ্টরূপে তার হুকুম আহকাম ও পন্থা বলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বয়ং তাঁর বাস্তব জীবনে তা কার্যকর করে তাঁর অনুসারীদের বুঝাবার এবং হৃদয়ংগম করার হক আদায় করেছেন। অতএব প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সেসব মূল্যবান নির্দেশ মেনে নেয়া, স্মরণ রাখা এবং তদনুযায়ী নিজের জাহের ও বাতেনকে (বাহ্যিক আভ্যন্তরীণ দিক) পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা। মন ও মস্তিষ্ককে মতবাদ ও চিন্তাধারা এবং শিরক ও কুফরের আকীদাহ-বিশ্বাস থেকে পবিত্র রাখা, নিজের শরীর, পোষাক ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলোকেও সকল প্রকার অপবিত্রতা ও মলিনতা থেকে পাক রাখাও প্রত্যেকের অপরিহার্য কর্তব্য। শিরক কুফরের আকীদাহ-বিশ্বাসসমূহ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে প্রকাশ্য নাজাসাতগুলোর (নাপাকীর) হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে।

নাজাসাতের (অপবিত্রতার) বর্ণনা

নাজাসাত (نجاست) অর্থ হচ্ছে অপবিত্রতা। এ হলো তাহারাত (طهارت) বা পবিত্রতার বিপরীত। তাহারাতের মর্ম, পন্থা-পদ্ধতি, হুকুম-আহকাম এবং মাসয়ালা জানার জন্য প্রথমে প্রয়োজন নাজাসাতের মর্ম, তার প্রকারভেদ এবং তা পাক করার নিয়ম-পদ্ধতি যেনে নেয়া। এ জন্য প্রথমেই নাজাসাতের হুকুমগুলো ও সে সম্পর্কিত মাসয়ালাগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে।

নাজাসাতের প্রকারভেদ

নাজাসাত দুই প্রকারের। নাজাসাতে হাকিকী ও নাজাসাতে হুমকী। উভয়ের হুকুম

আহকাম ও মাসায়ালা পৃথক পৃথক। পবিত্রতা অর্জন করার জন্য তার হুকুম ও মাসয়ালাগুলো ভালো করে বুঝে তা মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী।

১. নাজাসাতে হাকিকী

নাজাসাতে হাকিকী হচ্ছে ঐসব মল-মূত্র ও ময়লা জিনিস যা সাধারণতঃ মানুষের ঘৃণার উদ্রেক করে এবং প্রত্যেকে সেসব থেকে নিজের শরীর, জামা-কাপড় ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস-পত্রকে রক্ষা করতে চায়। শরীয়তও এসব থেকে দূরে থাকার এবং পাক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন মল,মূত্র, রক্ত ইত্যাদি। এ আবার দু'প্রকারের-নাজাসাতে গালিজা এবং নাজাসাতে খাফিফা।

ক. নাজাসাতে গালিজা

ঐসব জিনিসকে নাজাসাতে গালিজা বলা হয় যাদের নাপাক হওয়া সম্পর্কে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সেগুলোকে ঘৃণা করে এবং শরীয়ত সেগুলোকে নাপাক বলে ঘোষণা করে। এসবের অপবিত্রতা খুব তীব্রভাবে অনুভূত হয় এবং সে জন্য শরীয়তে এসবের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ রয়েছে। নিম্নে নাজাসাতে গালিজা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে।

১. শুকর। তার প্রতিটি বস্তুই নাজাসাতে গালিজা। সে জীবিত হোক অথবা মৃত।

২. মানুষের পেশাব, পায়খানা, মল ও প্রশ্রাবের দ্বার দিয়ে নির্গত যে কোন তরল বস্তু, সকল পশুর এবং ছোট ছেলেমেয়েদের পেশাব-পায়খানা।

৩. মানুষ অথবা পশুর রক্ত।

৪. বমি, যে কোন বয়সের মানুষের হোক।

৫. ক্ষতস্থান থেকে নির্গত পুঁজ, রস, অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ।

৬. যেসব পশুর ঝুটা নাপাক তাদের ঘাম ও লালা।

৭. জবেহ করা ব্যতীত যেসব পশু মারা গেছে তাদের গোশত, চর্বি ইত্যাদি এবং চামড়া নাজাসাতে গালিযা। অবশ্যি চামড়া দাবাগাত বা পাকা (Tanning) করা হলে তা পাক। ঠিক তেমনি যার মধ্যে রক্ত চলাচল করে না, যেমন শিং, দাঁত, ক্ষুর ইত্যাদি পাক।

৮. হারাম পশুর (জীবিত অথবা মৃত) দুধ এবং মৃত পশুর (হালাল অথবা হারাম) দুধ।

৯. মৃত পশুর দেহ থেকে নির্গত তরল পদার্থ।

১০. নাপাক বস্তু থেকে নির্গত নির্যাস অথবা ঐ ধরনের কোন বস্তু।

১১. পাখী ব্যতীত সকল পশুর পেশাব পায়খানা। গরু, মহিষ, হাতি, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর প্রভৃতির গোবর, উট, ছাগল প্রভৃতির লাদ। উড়তে পারে না এমন পাখী, যেমন হাঁস-মুরগী ইত্যাদির পায়খানা। সকল হিংস্র পশুর পেশাব পায়খানা।

১২. মদ এবং অন্যান্য তরল মাদক দ্রব্য।

১৩. সাপের খাল।

১৪. মৃত ব্যক্তির মুখের লালা।

১৫. শহীদ ব্যক্তির দেহ থেকে নির্গত রক্ত যা প্রবাহিত হয়।

খ. নাজাসাতে খফীফা

ঐসব জিনিস নাজাসাতে খফীফা যার ময়লা কিছুটা হালকা। শরীয়তের কোন কোন দলিল-প্রমাণ থেকে তাদের পাক হওয়া সন্দেহ হয়। এজন্যে শরীয়তে তাদের সম্পর্কে হুকুমও কিছুটা লঘু। নিম্নে এমন সব জিনিসের নাম করা হচ্ছে যা নাজাসাতে খফীফা ঃ

১. হালাল পশুর পেশাব, যেমন– গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি।

২. ঘোড়ার পেশাব।

৩. হারাম পাখীর মল, যেমন- কাক, চিল, বাজ প্রভৃতি। অবশ্যি বাদুরের পেশাব-পায়খানা পাক।

৪. হালাল পাখীর পায়খানা যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

৫. নাজাসাতে খফীফা যদি নাজাসাতে গালিজার সাথে মিশে যায় তা গালিজার পরিমাণ যতোই কম হোক না কেন, তথাপি তা নাজাসাতে গালিজা হ'য়ে যাবে।

নাজাসাতে হাকিকী থেকে পাক হওয়ার পদ্ধতি

নাপাক হওয়ার জিনিসগুলো যেমন বিভিন্ন ধরনের তেমনি তা থেকে পাক হওয়ার পদ্ধতিও ভিন্ন। যেমন কতকগুলো জিনিস স্থির থাকে, কতকগুলো হালকা এবং বয়ে যায়। কতকগুলো আর্দ্র তা শুকিয়ে যায়। কতকগুলো শুকায় না অথবা অল্পমাত্রায় শুকায়। কতকগুলো ময়লা নি:শেষ হয়ে যায়। সে জন্য তাদের পাক করার নিয়ম পদ্ধতি ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

মাটি প্রভৃতি পাক করার নিয়ম

১. মাটি নাপাক হলে, অল্প কিংবা তরল মল দ্বারা হোক অথবা ঘন গাঢ় মল দ্বারা উভয় অবস্থাতেই শুকিয়ে গেলেই পাক হয়ে যাবে। কিন্তু এমন মাটিতে তায়াম্মুম করা ঠিক হবে না।

২. নাপাক মাটি শুকোবার আগে তাতে ভালো করে পানি ঢেলে দিতে হবে যেন পানি বয়ে যায়। অথবা পানি ঢেলে দিয়ে তা কোন কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে চুষিয়ে নিতে হবে যেন মলের কোন চিহ্ন না থাকে বা গন্ধ না থাকে। এতেও মাটি পাক হয়ে যাবে। অবশ্যি তিন বার এ রকম করা উচিত।

৩. মাটি, ঢিল, বালু, পাথর প্রভৃতি শুকে গেলে পাক হয়। যে পাথর মসৃণ নয় এবং তরল বস্তু চুষে নেয় তা শুকে গেলে পাক হয়।

৪. মাটি থেকে উদগত ঘাস, শস্য, গাছের চারা নাপাক হওয়ার পর শুকে গেলে পাক হয়ে যায়।

৫. মাটিতে যেসব জিনিস সুদৃঢ় হয়ে থাকে, যেমন দেয়াল, স্তম্ভ, বেড়া, টাটি চৌকাঠ প্রভৃতি, তা শুকে গেলে পাক হয়ে যায়।

৬. নাপাক মাটি ওলট পালট করে দিলেও তা পাক হয়ে যায়।

৭. চুলা যদি মল দ্বারা নাপাক হয়ে যায় তাহলে আগুন জ্বালিয়ে ময়লার চিহ্ন মিটিয়ে দিলে পাক হয়ে যায়।

৮. নাপাক যমীনের উপর মাটি ঢেলে দিয়ে মল এভাবে ঢেকে দিতে হবে যেন মলের গন্ধ না আসে, তাহলে তা পাক হয়ে যাবে। অবশ্যি তাতে তায়াম্মুম করা যাবে না।

৯. নাপাক মাটি থেকে তৈরী পাত্র যতোক্ষণ কাঁচা থাকে ততোক্ষণ নাপাক। তা যখন শুকে পাকা হয়ে যাবে তখন পাক হবে।

১০. গোবর মাখা মাটি নাপাক। তার উপর কোন কিছু বিছিয়ে না নিলে নামায পড়া দুরস্ত হবে না।

নাপাক শোষণ করে নিতে পারে না এমন জিনিস পাক করার নিয়ম

১. ধাতু নির্মিত জিনিস, যেমন তলোয়ার, ছুরি, চাকু, আয়না, সোনা, চাঁদি ও অন্যান্য ধাতুর গহনা অথবা তামা, পিতল, এলোমিনিয়াম ও স্টীলের বাসন বাটি প্রভৃতি নাপাক হয়ে গেলে মাটি দিয়ে ঘষে মেজে নিলে অথবা ভিজে কাপড় দিয়ে ভাল করে মুছে ফেললে পাক হয়ে যাবে। এমনভাবে ঘষে মেজে নিতে হবে বা মুছে ফেলতে হবে যে, নাজাসাতের কোন চিহ্ন বা গন্ধ না থাকে। অবশ্য জিনিষগুলো যেন নকশী না হয়।

২. চিনা মাটি, কাঁচ অথবা মসৃণ পাথরের থালা, বাটি অথবা পুরাতন ব্যবহৃত থালা, বাটি, পাতিল যা নাজাসাত চুষে নিতে পারে না, মাটি দিয়ে ঘষে মেজে নিলে অথবা ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে ফেললে পাক হয়। এমনভাবে তা করতে হবে যেন নাপাকির কোন চিহ্ন না থাকে। অবশ্যি যদি তা নকশী না হয়।

৩. ধাতু নির্মিত জিনিস অথবা চিনা মাটির জিনিস তিনবার পানি দিয়ে ধুলে পাক হয়।

৪. এসব জিনিষ-পত্র যদি নকশী হয়, যেমন অলংকার অথবা নকশী থালাবাটি, তাহলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা ব্যতীত শুধু ঘষলে অথবা ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে ফেললে পাক হবে না।

৫. ধাতু নির্মিত থালা, বাটি অথবা অন্যান্য জিনিষ-পত্র যেমন চাকু, ছুরি, চিমটা, বেড়ী প্রভৃতি আগুনে দিলে পাক হয়।

৬. মাটি ও পাথরের থালা- বাটি আগুনে দিলে পাক হয়ে যায়।

৭. চাটাই, চৌকি, টুল-বেঞ্চ অথবা এ ধরনের কোন জিনিষের উপর ঘন বা তরল ময়লা লেগে গেলে শুধু ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে দিলে পাক হবে না। পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

যেসব জিনিষ নাজাসাত চুষে নেয় তা পাক করার নিয়ম

১. মুজা, জুতা অথবা চামড়ার তৈরী অন্যান্য জিনিষ যদি নাপাক হয়ে যায় আর নাজাসাত যদি ঘন হয় যেমন – গোবর, পায়খানা, রক্ত, প্রভৃতি, তাহলে নাজাসাত চেঁছে বা ঘষে তুলে ফেললে পাক হয়ে যায়। আর নাজাসাত যদি তরল হয় এবং শুকে গেলে দেখা না যায়, তাহলে না ধুলে পাক হবে না। তা ধুয়ে ফেলার নিয়ম এই যে প্রত্যেক বার ধুবার পর এতটা বিলম্ব করতে হবে যেন পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে তিনবার ধুতে হবে।

২. মাটির নতুন বরতন (থালা, বাটি, বদনা) অথবা পাথরের বরতন যা পানি চুষে নেয় অথবা কাঠের বরতন যাতে নাজাসাত মিশে যায় এ ধরনের থালা বাটি অথবা ব্যবহারের জিনিষ-পত্র নাপাক হয়ে যায়, তাহলে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তা তিনবার ধুতে হবে এবং প্রতিবারে এতখানি শুকনো হতে হবে যেন পানি টপকানো থেমে যায়। কিন্তু প্রবাহিত পানিতে ধুতে গেলে এ শর্ত পালনের দরকার নেই। ভালো করে ধুয়ে ফেলার পর পানি সব নিংড়ে গেলেই যথেষ্ট হবে।

৩. খাদ্য শস্য নাপাক হলে তিনবার ধুতে হবে এবং প্রত্যেক বার শুকাতে হবে, যদি নাজাসাত গাঢ় হয় এবং এক স্থানে জমা হয়ে থাকে তাহলে তা সরিয়ে ফেললেই হবে। যেমন শস্যের স্তুপের উপর বিড়াল পায়খানা করেছে এবং তা শুকে জমাট হয়ে আছে। তা সরিয়ে ফেললেই চলবে। বড়ো জোর অন্য শস্যের উপর যদি তার কোন লেশ আছে বলে সন্দেহ হয় তাহলে সেগুলো তিনবার ধুয়ে ফেলতে হবে।

৪. কাপড়ে নাজাসাত লাগলে তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেক বার ভালো করে চাপ দিয়ে নিংড়াতে হবে। ভালো করে নিংড়িয়ে ধুবার পরও যদি দুর্গন্ধ থেকে যায় কিংবা দাগ থাকে তাতে কোন দোষ নেই, পাক হয়ে যাবে।

৫. পানির মতো যেসব জিনিষ তরল এবং যদি তৈলাক্ত না হয় তাহলে তা দিয়ে কাপড়ে লাগা নাজাসাত ধুয়ে পাক করা যায়।

৬. প্রবাহিত পানিতে কাপড় ধোবার সময় নিংড়াবার দরকার নেই। কাপড়ের একদিক থেকে অন্যদিকে পানি চলে গেলেই যথেস্ট।

৭. কাপড় যদি এমন হয় যে চাপ দিয়ে নিংড়াতে গেলে তা ফেটে যাবে, তাহলে তিনবার ধুয়ে দিতে হবে। তারপর হাত দিয়ে অথবা অন্য কিছু দিয়ে এমনভাবে চাপ দিতে হবে যেন পানি বেরিয়ে যায় এবং কাপড়ও না ফাটে।

৮. যদি কোন মৃতের চর্বি দ্বারা কাপড় নাপাক হয় তাহলে তিনবার ধুলেই যথেস্ট হবে না। তৈলাক্ততা দূর করে ফেলতে হবে।

৯. চাটাই, বড় সতরঞ্জী, কার্পেট বা এ ধরনের কোন বিছানাপত্র যা নিংড়ানো যায় না, তার উপর যদি নাজাসাত লাগে তাহলে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তার উপর তিনবার পানি ঢালতে হবে। প্রত্যেকবার পানি ঢালার পর শুকাতে হবে। শুকাবার অর্থ এই যে, তার উপর কিছু রাখলে তা ভিজে উঠবে না।

১০. কোন খালিপাত্র যদি নাপাক হয় এবং তা নাজাসাত চুষে নিয়ে থাকে তাহলে তা পাক করার পদ্ধতি এই যে, তা পানি দিয়ে ভর্তি করতে হবে। নাজাসাতের চিহ্ন বা প্রভাব পানির মধ্যে দেখা গেলে পানি ফেলে দিয়ে আবার ভরতে হবে। যতোক্ষণ পানিতে নাজাসাতের লেশ পাওয়া যায় ততোক্ষণ এভাবে পানি ফেলতে হবে এবং নতুন পানি ভরতে হবে। এমনি করে যখন নাজাসাতের রং এবং দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে তখন পাত্র পাক হয়ে যাবে।

১১. নাপাক রঙে রং করা কাপড় পাক করার জন্য এতবার ধুতে হবে যেন পরিষ্কার পানি আসতে থাকে। তারপর রং থাক বা না থাক কাপড় পাক হয়ে যাবে।

তরল ও তৈলাক্ত জিনিস পাক করার নিয়ম

১. তেল অথবা ঘি যদি নাপাক হয় তাহলে তেল বা ঘিয়ে সমপরিমাণ পানি ঢেলে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। পানি শেষ হবার পর পুনরায় ঐ পরিমাণ পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। এভাবে তিনবার করলে তা পাক হবে। অথবা তেল বা ঘিয়ের মধ্যে পানি দিতে হবে। পানির উপর তেল বা ঘি এসে যাবে। তখন তা

উপর থেকে তুলে নিয়ে আবার পানি ঢালতে হবে। এভাবে তিনবার করলে তা পাক হয়ে যাবে।

২. মধু, সিরাপ বা সরবত যদি নাপাক হয় তাহলে তাতে পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। পানি সরে গেলে আবার পানি দিতে হবে। এভাবে তিনবার করলে তা পাক হবে।

জমাট জিনিষ পাক করার নিয়ম

১. জমাট হওয়া ঘি, চর্বি অথবা মধু যদি নাপাক হয়, তাহলে নাপাক অংশটুকু বাদ দিলেই পাক হয়ে যাবে।

২. সানা আটা অথবা শুকনো আটা নাপাক হয়ে গেলে নাপাক অংশ তুলে ফেললেই বাকীটা পাক হয়ে যাবে। যেমন ছানা আটার উপরে কুকুরে মুখ দিয়েছে, তাহলে সে অংশটুক ফেলে দিলেই পাক হয়ে যাবে। অথবা শুকনো আটায় যদি মুখ দেয় তাহলে তার মুখের লালা যতখানিতে লেগেছে বলে মনে হবে ততখানি আলাদা করে দিলে বাকীটুকু পাক হয়ে যাবে।

৩. সাবানে যদি কোন নাপাক লাগে তাহলে নাপাক অংশ কেটে ফেললেই বাকী অংশ পাক থাকবে।

চামড়া পাক করার নিয়ম

১. দাবাগাত (পাকা) করার পর প্রত্যেক চামড়া পাক হয়ে যায়। সে চামড়া হালাল পশুর হোক অথবা হারাম পশুর। হিংস্র পশুর হোক অথবা তৃণভোজী পশুর। কিন্তু শুকরের চামড়া কোন ক্রমেই পাক হবে না।

২. হালাল পশুর চামড়া জবেহ করার পরই পাক হয়, তা পাক করার জন্যে দাবাগাত করার দরকার হয় না।

৩. যদি শুকরের চর্বি অথবা অন্য কোন নাপাক জিনিষ দিয়ে চামড়া পাকা করা হয় তাহলে তা তিনবার ধুয়ে ফেললেই পাক হবে।

শরীর পাক করার নিয়ম

১. যদি নাপাক রঙে শরীর বা চুল রাঙানো হয়, তাহলে এতটুকু ধুলে যথেষ্ট হবে যাতে পরিষ্কার পানি বেরুতে থাকে। রং তুলে ফেলা দরকার করে না।

২. শরীরে উল্কি এঁকে যদি তার মধ্যে কোন নাপাক জিনিষ ভরে দেওয়া হয়, তাহলে তিনবার ধুলেই শরীর পাক হবে। ঐ নাপাক জিনিষ বের করে ফেলার দরকার নেই।

৩. যদি ক্ষতের মধ্যে কোন নাপাক জিনিষ ঢুকিয়ে দেয়া হয় তার পর ক্ষত ভালো

হয়ে গেল, তাহলে ঐ নাপাক জিনিষ বের করে ফেলার দরকার নেই। শুধু ধুলেই শরীর পাক হবে। যদি হাড় ভেঙ্গে যায় তার স্থানে যদি নাপাক হাড় বসানো হয়, অথবা ক্ষত স্থান নাপাক জিনিষ দিয়ে সিলাই করা হলো, অথবা ভাঙ্গা দাঁত কোন নাপাক জিনিস দিয়ে জমিয়ে দেয়া হলো– এ সকল অবস্থায় সুস্থ হওয়ার পর তিনবার পানি দিয়ে ধুলেই পাক হয়ে যাবে।

৪. শরীরে নাপাক তেল অথবা অন্য কোন তৈলাক্ত কিছু মালিশ করার পর শুধু তিনবার ধুয়ে ফেললেই শরীর পাক হবে তৈলাক্ততা দূর করার প্রয়োজন নেই।

তাহারাতের ছয়টি কার্যকর মূলনীতি

১. অযথা পরিশ্রম থেকে বাঁচার জন্যে তাহারাতের হুকুম লাঘব করা হয়।

অর্থাৎ যে হুকুমগুলো কিয়াসের দ্বারা প্রমাণিত, তাদের মধ্যে কোন সময়ে যদি কোন অসাধারণ অসুবিধা হয়ে পড়ে, তাহলে শরীয়তের পক্ষ থেকে ক্ষমা করা হয়। যেমন ধরুন, মাইয়েত ধুয়ে দেবার সময় তার লাশ থেকে যে পানি পড়ে তা নাপাক। কিন্তু যারা লাশ ধুয়ে দেয় তাদের শরীরে যদি সে পানি ছিটা পড়ে তাহলে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে। কারণ তা থেকে শরীরকে রক্ষা করা খুব কঠিন।

২. সাধারণতঃ যেসব বিষয়ের সাথে মানুষ জড়িত হয়ে পড়ে তাও অযথা পরিশ্রমের মধ্যে শামিল। অর্থাৎ যে কাজ সাধারণতঃ সকলেই করে থাকে এবং কিয়াসের দ্বারা তাকে নাপাক বলা হয়। কিন্তু তা পরিহার করা বড়ই কঠিন। এ জন্যে এ বিষয়ে শরীয়তের হুকুম সহজ করা হয়েছে। যেমন ধরুন বৃষ্টির সময় সাধারণত ঃ রাস্তায় পানি কাদা হয়ে যায়। তার থেকে নিজেকে বাঁচানো খুব মুশকিল। সে জন্যে কাদা পানি ছিটা কাপড়ে লাগলে তা মাফ করা হয়েছে।

৩. যে জিনিস বিশেষ প্রয়োজনে জায়েয বলা হয়েছে তা প্রয়োজন হলেই জায়েয হবে। অর্থাৎ যে জিনিস কোন সময়ে কোন বিশেষ প্রয়োজনে জায়েয করা হয়েছে, তা শুধু সে অবস্থায় জায়েয হবে। অন্য অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে তা জায়েয হবে না। যেমন, পশুর সাহায্যে শস্য মাড়াবার সময় শস্যের উপর পশু পেশাব করে দিলে প্রয়োজনের খাতিরে তা মাফ এবং শস্য পাক থাকবে। কিন্তু এ সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে শস্যের উপর পেশাব করলে তা নাপাক হবে।

৪. যে নাপাক একবার মিটে গেছে তা পুনরায় ফিরে আসবে না। অর্থাৎ শরীয়তে

যে নাপাকী খতম হয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয় তা আর পুনরায় হবে না। যেমন নাপাক মাটি শুকাবার পরে তা পাক হয়। তারপর ভিজে গেলে সে নাপাকি আর ফিরে আসে না।

৫. বিশ্বাস এবং দৃঢ় ধারণার স্থলে কুসংস্কার ও সন্দেহের কোন মূল্য দেয়া হবে না। অর্থাৎ যে বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাস অথবা দৃঢ় ধারণা আছে যে, তা পাক, তাহলে তা পাকই হবে। শুধু সন্দেহের কারণে তা নাপাক বলা যাবে না।

৬. সাধারণভাবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী হুকুম দিতে হবে। অর্থাৎ জায়েয নাজায়েয হুকুম দেবার সময় প্রচলিত নিয়ম ও অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন, মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস এই যে সকলে খানাপিনাকে নাপাকি থেকে রক্ষা করতে চায়। অতএব অমুসলমানদের খানাপিনার বস্তুকেও পাক মনে করতে হবে। তা নাপাক বলা তখনই ঠিক হবে যখন কোন প্রকৃত দলিল প্রমাণ দ্বারা তার নাপাক হওয়াটা জানা যাবে।

তাহারাতের হুকুমগুলোতে শরীয়তের সহজীকরণ

১. নাজাসাতে গালিজা এক দিরহাম পরিমাণ মাফ। গাঢ় হলে এক দিরহাম ওজন পরিমাণ এবং তরল হলে এক দিরহাম আকারের পরিমাণ। অর্থাৎ এ পরিমাণে শরীর অথবা কাপড়ে নাজাসাতে গালিজা লাগলে যদি তা নিয়ে নামায আদায় করা হয় তবে নামায হয়ে যাবে, দোহরাতে হবে না। অবশ্যি ধুয়ে ফেলার সুযোগ হলে তা করা উচিত।

২. নাজাসাতে খফিফা যদি শরীর অথবা কাপড়ে লাগে তাহলে এক চতুর্থাংশ পরিমাণ মাফ।

৩. মাইয়েত গোসল করার সময় গোসলকারীদের যে ছিটা লাগে তা মাফ।

৪. উঠানে মাড়া দেবার সময় পশু পেশাব করলে শস্য পাক থাকে।

৫. পেশাব অথবা অন্য কোন নাজাসাতের সূচের মাথা পরিমাণ ছিটা কাপড়ে বা শরীরে লাগলে তা নাপাক হবে না যারা গৃহপালিত পশু বাড়ীতে প্রতিপালন করে তাদের শরীরে বা কাপড়ে পশুর পেশাব গোবর ইত্যাদি লাগলে তা এক দিরহামের বেশী হলেও মাফ।

৬. বর্ষার সময় যখন রাস্তাঘাটে পানি কাঁদা হয়ে যায় এবং তা থেকে বাঁচা মুস্কিল হলে তার ছিটা মাফ।

৭. খাদ্য শস্যের সাথে ইঁদুরের পায়খানা মিশে গেলে এবং তা যদি এরূপ অল্প পরিমাণ হয় যে, তার কোন প্রভাব আটার মধ্যে অনুভব করা যায় না তাহলে সে আটা পাক। যদি কিছু পরিমাণ ইঁদুরের মল রুটি বা ভাতের সংগে রান্না হয়ে

যায় এবং তা যদি গলে না গিয়ে শক্ত থাকে, তাহলে সে খাদ্য পাক থাকবে এবং খাওয়া যেতে পারে।

৮. মানুষের রক্ত শোষণকারী ঐসব প্রাণী যাদের মধ্যে চলাচলকারী রক্ত নেই, যেমন মাছি, মশা, ছারপোকা ইত্যাদি। তারা যদি মানুষের রক্ত পান করে এবং তাদের মারলে যদি শরীরে বা কাপড়ে রক্ত লাগে তাহলে শরীর ও কাপড় নাপাক হবে না।

৯. নাজাসাত আগুনে জ্বালালে তার ধুঁয়া পাক এবং ছাইও পাক। যেমন গোবর জ্বালালে তার ধুঁয়া যদি রুটি বা কোন খাদ্যে লাগে অথবা তার ছাই দিয়ে থালা বাটি মাজা হয় তা জায়েয । কোন কিছু নাপাক হবে না।

১০. নাপাক বিছানায়-চাটাইয়ে, চৌকি অথবা মাটিতে যদি কেউ শয়ন করে আর যদি ভিজা থাকে অথবা নাপাক বিছানা অথবা মাটিতে কেউ ভিজা পা দেয় অথবা নাপাক বিছানার উপর শয়ন করার পর ঘাম আসে এসকল অবস্থায় যদি শরীরের উপর নাজাসাতের প্রভাব সুস্পষ্ট না হয় তাহলে শরীর পাক থাকবে।

১১. দুধ দোহন করার সময় যদি হঠাৎ দু এক টুকরা গোবর দুধে পড়ে যায়, গাভীর হোক অথবা বাছুরের, তাহলে তা সংগে সংগে তুলে ফেলতে হবে। এ দুধ পাক থাকবে এবং তা পান করতে দোষ নেই।

১২. ভিজা কাপড় কোন নাপাক জায়গায় শুকাবার জন্যে দেয়া হয়েছে অথবা এমনিই রাখা হয়েছে অথবা কেউ নাপাক চৌকির উপর বসে পড়েছে আর তার কাপড় ভিজা ছিল, তাহলে কাপড় নাপাক হবে না। কিন্তু কাপড়ে যদি নাজাসাত অনুভব করা যায় তাহলে পাক থাকবে না।

পাক নাপাকের বিভিন্ন মাসয়ালা

১. মাছ, মাছি, মশা, ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়। শরীর এবং কাপড়ে তা লাগলে নাপাক হবে না।

২. সতরঞ্জি, চাটাই বা এ ধরণের কোন বিছানার এক অংশ নাপাক এবং বাকি অংশ পাক হলে পাক অংশে নামায পড়া ঠিক হবে ।

৩. হাত পা এবং চুলে মেহেদী লাগাবার পর মনে হলো যে মেহেদী নাপাক ছিল। তখন তিন বার ধুয়ে ফেললেই পাক হবে মেহেদীর রং উঠাবার প্রয়োজন নেই।

৪. চোখে সুরমা অথবা কাজল লাগানোর পর জানা গেল যে, এ নাপাক ছিল। এখন তা মুছে ফেলা বা ধুয়ে ফেলা ওয়াজেব নয়। কিন্তু কিছু পরিমাণ যদি প্রবাহিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তা ধুয়ে ফেলতে হবে।

৫. কুকুরের লালা নাপাক কিন্তু শরীর নাপাক নয়। কুকুর যদি কারো শরীর অথবা কাপড় ছুয়ে দেয় আর যদি তার গা ভিজাও হয় তথাপি কাপড় বা শরীর নাপাক হবে না। কিন্তু কুকুরের গায়ে কোন নাপাক লেগে থাকলে তখন সে ছুলে কাপড় বা শরীর নাপাক হবে।

৬. এমন মোটা তক্তা যে তা মাঝখান থেকে ফাঁড়া যাবে, তাতে নাজাসাত লাগলে উল্টা দিকের উপর নামায পড়া যাবে।

৭. মানুষের ঘাম পাক সে মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান, আর নাপাক ব্যক্তির ঘামও পাক।

৮. নাজাসাত জ্বালায়ে তার ধূঁয়া দিয়ে কোন কিছু রান্না করলেও তা পাক হবে। নাজাসাত থেকে উত্থিত বাষ্পও পাক।

৯. মিশ্‌ক্ এবং মৃগনাভি পাক।

১০. ঘুমন্ত অবস্থায় মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে যদি শরীর এবং কাপড়ে লাগে তা পাক থাকবে।

১১. হালাল পাখীর ডিম পঁচে গেলেও পাক থাকে। কাপড় অথবা শরীরে লাগলে তা পাক থাকবে।

১২. যদি কোন কিছু নাপাক হয়ে যায় কিন্তু কোন স্থানে নাজাসাত লেগেছে তা স্মরণ নেই, তখন সবটাই ধুয়ে ফেলা উচিত।

১৩. কুকুরের লালা যদি ধাতু নির্মিত বা মাটির বাসনপত্রে লাগে তাহলে তিনবার ভাল করে ধুলে পাক হয়ে যাবে। উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, একবার মাটি দিয়ে মেজে পানি দিয়ে ধুতে হবে এবং দু'বার শুধু পানি দিয়ে ধুতে হবে।

নাজাসাতে হুকমী

নাজাসাতে হুকমী নাপাকীর এমন এক অবস্থা যা দেখা যায় না। শরীয়তের মাধ্যমে তা জানা যায়। যেমন অজুহীন হওয়া, গোসলের প্রয়োজন হওয়া। নাজাসাতে হুকমীকে হাদাসও বলে।

নাজাসাতে হুকমীর প্রকার ভেদ

নাজাসাতে হুকমী বা হাদাস দু'প্রকার ঃ হাদাসে আসগার এবং হাদাসে আকবার।

হাদাসে আসগার

পেশাব পায়খানা করলে, পায়খানার দ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত হলে, শরীরের কোন অংশ থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হলে, মুখ ভরে বমি হলে, ঠেস দিয়ে ঘুমালে ইত্যাদিতে যে নাপাকীর অবস্থা হয় তাকে হাদাসে আসগার বলে। এর থেকে পাক হতে হলে

অযু করতে হবে। পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহার ক্ষতিকারক হলে তায়াম্মুম দ্বারাও পাক হওয়া যায়। হাদাসে আসগার অবস্থায় নামায পড়া যাবে না, কুরআন পাক স্পর্শ করা যাবে না। কিন্তু যাদের হাতে সর্বদা কুরআন থাকে এবং বার বার অযু করা মুশকিল অথবা কুরআন পাঠকারী যদি শিশু হয় তাহলে অযু ছাড়া চলতে পারে। বিনা অযুতে অর্থাৎ হাদাসে আসগার অবস্থায় মৌখিক কুরআন পাঠ করা যায়।

হাদাসে আকবার

হাদাসে আকবার থেকে পাক হতে হলে গোসল করতে হয়। গোসল করা সম্ভব না হলে তায়াম্মুম দ্বারাও পাক হওয়া যায়। হাদাসে আকবারের অবস্থায় নামায পড়া যাবে না, কুরআন পাক স্পর্শ করা যাবে না, মৌখিক কুরআন তেলাওয়াতও করা যাবে না এবং মসজিদে প্রবেশ করাও যাবে না। কিন্তু অত্যাবশ্যক কারণে মসজিদে যাওয়া যাবে। যেমন গোসলখানার রাস্তা মসজিদের ভেতর দিয়ে, পানি পাত্রের জন্যে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি শরীয়ত দান করে।

অযুর বিবরণ

অযুর ফজিলত ও বরকত

অযুর মহত্ব ও গুরুত্ব এর চেয়ে অধিক কি হতে পারে যে স্বয়ং কুরআনে তার শুধু হুকুমই নেই, বরঞ্চ তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অযুতে দেহের কোন্ কোন্ অঙ্গ ধুতে হবে। আর একথাও সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে অযু নামাযের অপরিহার্য শর্ত।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ - (المائده : ٦)

– যারা তোমরা ঈমান এনেছো জেনে রেখো, যখন তোমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াবে তার আগে নিজেদের মুখ-মণ্ডল ধুয়ে নেবে, এবং তোমাদের দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেবে এবং মাথা মাসেহ করবে এবং তারপর দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেলবে। (মায়েদাহ ঃ ৬)।

নবী (সঃ) অযুর ফযিলত ও বরকত বয়ান করতে গিয়ে বলেন–

আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের লোকদেরকে চিনে ফেলবো। কোন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে, হে আল্লাহর রসূল? নবী (সা:) বলেন, এজন্যে তাদেরকে চিনতে পারব যে অযুর বদৌলতে আমার উম্মতের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা উজ্জ্বলতায় ঝক্ঝক্ করবে।

উপরন্তু তিনি আরো বলেন, অযু করার কারণে ছোটো খাটো গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং অযুকারীকে আখেরাতে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হবে এবং অযুর দ্বারা শারীরের সমস্ত গুনাহ ঝরে পড়ে। (বুখারী, মুসলিম)

অযুর মসনুন তরিকা

অযুকারী প্রথমে মনে মনে এ নিয়ত করবে, আমি শুধু আল্লাহকে খুশী করার জন্য

এবং তাঁর কাছ থেকে আমলের প্রতিদান পাবার জন্যে অযু করছি। তারপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে অযু শুরু করবে এবং নিম্নের দোয়া পড়বে। (আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী)।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ

– হে আল্লাহ! আমার গোনাহ মাফ কর, আমার বাসস্থান আমার জন্যে প্রশস্ত করে দাও, এবং রুজিতে বরকত দাও। (নাসায়ী)

অযুর জন্যে প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত খুব ভালো করে তিনবার ঘষে ধুতে হবে। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করতে হবে। মেসওয়াকও করতে হবে।

কোন সময়ে মিসওয়াক না থাকলে শাহাদাৎ আঙ্গুলি দিয়ে ভালো করে ঘষে দাঁত সাফ করতে হবে। রোযা না থাকলে তিনবারই গড় গড়া করে কুলি করতে হবে। তার উদ্দেশ্য গলদেশের ভেতর পর্যন্ত পানি পৌছানো। তারপর তিনবার এমনভাবে নাকে পানি দিতে হবে যেন নাসিকার ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে। অবশ্য রোযার সময় সাবধানে কাজ করতে হবে। তারপর বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাক সাফ করতে হবে। প্রত্যেকবার নাকে নতুন পানি দিতে হবে। তারপর দু'হাতের তালু ভরে পানি নিয়ে তিনবার সমস্ত মুখমন্ডল (চেহারা) এমনভাবে ধুতে হবে যেন চুল পরিমাণ স্থানও শুকনো না থাকে। দাড়ি ঘন হলে তার মধ্যে খিলাল করতে হবে যেন চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। চেহারা ধুবার সময় এ দোয়া পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ –

– হে আল্লাহ! আমার চেহারা সেদিন উজ্জ্বল করে দিও যেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু লোকের মলিন হবে।

তারপর দু'হাত কনুই পর্যন্ত ভালো করে ঘষে ঘষে ধুবে। প্রথম ডান হাত এবং পরে বাম হাত তিন তিনবার করে ধুতে হবে। হাতে আংটি থাকলে এবং মেয়েদের হাতে চুড়ি-গয়না থাকলে তা নাড়াচাড়া করতে হবে যেন ভালোভাবে পানি সবখানে পৌঁছে। হাতের আংগুলগুলোতে আংগুল দিয়ে খিলাল করতে হবে। তারপর দু'হাত ভিজিয়ে মাথা এবং কান মাসেহ করতে হবে।

মাসেহ করার পদ্ধতি

মাসেহ করার পদ্ধতি হলো বুড়ো এবং শাহাদাত অংগুলি আলাদা রেখে বাকী

দু'হাতের তিন তিন অংগুলি মিলিয়ে অংগুলিগুলোর ভেতর দিক দিয়ে কপালের চুলের গোড়া থেকে পিছন দিকে মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ্ করতে হবে। তারপর দু'হাতের হাতুলীর পেছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে মাথার তিন চতুর্থাংশে মাসেহ্ করতে হবে। তারপর শাহাদাত অংগুলি দিয়ে কানের ভেতরের অংশ এবং বুড়ো অংগুলি দিয়ে কানের বাইরের অংশ মাসেহ্ করতে হবে। তারপর দু'হাতের অংগুলিগুলোর পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসেহ্ করতে হবে। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে এভাবে কোন অংশ মাসেহ্ করতে ঐ অংশ দ্বিতীয় বার ব্যবহার করতে হয় না যা একবার ব্যবহার করা হয়েছে।

মাসেহ্ করার পর দু'পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার এমনভাবে ধুতে হবে যে, ডান হাত দিয়ে পানি ঢালতে হবে এবং বাম হাত দিয়ে ঘসতে হবে। বাম হাতের ছোট আংগুল দিয়ে পায়ের আংগুলগুলোর মধ্যে খিলাল করতে হবে। ডান পায়ে খিলাল ছোট আংগুল থেকে শুরু করে বুড়ো আংগুলে শেষ করতে হবে। বাম পায়ে খিলাল বুড়ো আংগুল থেকে ছোট আংগুল পর্যন্ত করতে হবে। অযুর কাজগুলো পর পর করে যেতে হবে। অর্থাৎ একটার পর সংগে সংগে অন্যটি ধুতে হবে। খানিকক্ষণ থেমে থেমে করা যেন না হয়।

অযু শেষ করে আসমানের দিকে মুখ করে তিনবার এ দোয়া পড়তে হয়।

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দাহ্ ও রসূল। হে আল্লাহ্, আমাকে ঐসব লোকের মধ্যে শামিল কর যারা বেশী বেশী তওবাকারী এবং আমাকে ঐসব লোকের মধ্যে শামিল কর যারা বেশী বেশী পাক সাফ থাকে।

অযুর হুকুম

যে যে অবস্থায় অযু ফরজ হয়

১. প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযু ফরয, সে নামায ফরয হোক অথবা ওয়াজিব, সুন্নত বা নফল হোক।

২. জানাযার নামাযের জন্য অযু ফরয।

৩. সিজদায়ে তেলাওয়াতের জন্য অযু ফরয।

যেসব অবস্থায় অযু ওয়াজিব

১. বায়তুল্লাহ তাওয়ারে জন্যে।

২. কোরআন পাক স্পর্শ করার জন্যে।

যেসব কারণে অযু সুন্নত

১. শোবার পূর্বে অযু সুন্নত।

২. গোসলের পূর্বে অযু সুন্নত।

অযুর ফরযসমূহ

অযুর চারটি ফরয এবং প্রকৃতপক্ষে এ চারটির নামই অযু। এ চারের মধ্যে কোন একটি বাদ গেলে অথবা চুল পরিমাণ কোন স্থান শুকনো থাকলে অযু হবে না।

১. একবার গোটা মুখমণ্ডল ধোয়া। অর্থাৎ কপালের উপর মাথার চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের গোড়া থেকে অপর কানের গোড়া পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডল ধোয়া ফরয।

২. দু'হাত অন্ততঃ একবার কনুই পর্যন্ত ধোয়া।

৩. একবার মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা।

৪. একবার দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধোয়া।

অযুর সুন্নতসমূহ

অযুর কিছু সুন্নত আছে। অযু করার সময় তা রক্ষা করা দরকার। অবশ্য যদিও তা ছেড়ে দিলে কিংবা তার বিপরীত কিছু করলেও অযু হয়ে যায়, তথাপি ইচ্ছা করে এমন করা এবং বার বার করা মারাত্মক ভুল। আশংকা হয় এমন ব্যক্তি গোনাহগার হয়ে যেতে পারে।

অযুর সুন্নত পনেরটি

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতে প্রতিদানের নিয়ত করা।

২. "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলা।

৩. মুখ ধোয়ার আগে কব্জি পর্যন্ত দু'হাত ধোয়া।

৪. তিন বার কুল্লি করা।

৫. মিসওয়াক করা।

৬. নাকে তিনবার পানি দেয়া।

৭. তিনবার দাড়ি খিলাল করা।

৮. হাত পায়ের আংগুলে খিলাল করা।

৯. গোটা মাথা মাসেহ্ করা।

১০. দু'কান মাসেহ্ করা।

১১. ক্রমানুসারে করা।

১২. প্রথমে ডান দিকের অংগ ধোয়া, তারপর বাম দিকের।

১৩. একটি অংগ ধোবার পর পরক্ষণেই দ্বিতীয়টি ধোয়া। একটির পর আর এাকটি ধুতে এতটা বিলম্ব না করা যে প্রথমটি শুকিয়ে যায়।

১৪. প্রত্যেক অংগ তিন তিনবার ধোয়া।

১৫. অযুর শেষে মসনুন দোয়া পড়া (পূর্বে দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে)।

অযুর মাকরূহ্ কাজগুলো

১. অযুর শিষ্টাচার ও মুস্তাহাব ছেড়ে দেয়া অথবা তার বিপরীত করা।

২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যয় করা।

৩. এতো কম পরিমাণ পানি ব্যবহার করা যে, অংগাদি ধুতে কিছু শুকনো থেকে যায়।

৪. অযুর সময় বাজে কথা বলা।

৫. জোরে জোরে পানি মেরে অংগাদি ধোয়া।

৬. তিন তিন বারের বেশী ধোয়া।

৭. নতুন পানি নিয়ে তিনবার মাসেহ্ করা।

৮. অযুর পরে হাতের পানি ছিটানো।

৯. বিনা কারণে অযুর মধ্যে ঐসব অংগ ধোয়া যা জরুরী নয়।

ব্যাণ্ডেজ এবং ক্ষত প্রভৃতির উপর মাসেহ্ করা

১. ভাঙা হাড়ের উপর কাঠ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বা প্লাস্টার করা আছে। অথচ সে স্থান ধোয়া অযুর জন্যে জরুরী। এখন তার উপর মাসেহ্ করলেই চলবে।

২. ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বা প্লাস্টার করা আছে। তাতে পানি লাগলে ক্ষতির আশংকা। এ অবস্থায় মাসেহ্ করলেই চলবে এবং তাতেও ক্ষতির আশংকা হলে তাও মাফ করা হয়েছে।

৩. যদি যখমের অবস্থা এমন হয়ে যে, ব্যাণ্ডেজ করতে দেহের কিছু সুস্থ অংশও তার মধ্যে আছে। এখন ব্যাণ্ডেজ খুললে বা খুলে সে ভালো অংশ ধুতে গেলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তাহলে মাসেহ্ করলেই চলবে।

৪. ব্যাণ্ডেজ খুলে দেহের ঐ অংশ ধুলে কোন ক্ষতির আশংকা নেই। কিন্তু খুললে আবার বাঁধবার কেউ নেই। এমন অবস্থায় মাসেহ করার অনুমতি আছে।

৫. ব্যান্ডেজের উপর আর এক ব্যাণ্ডেজ করা হলে তার উপরও মাসেহ করা যায়।

৬. কোন অংগে আঘাত বা জখম হয়েছে। পানি লাগালে ক্ষতির সম্ভাবনা। তখন মাসেহ করলেই যথেষ্ট হবে।

৭. যদি চেহারা বা হাত পা কেটে গিয়ে থাকে কিংবা কোন অংগে ব্যথা হলে এবং পানি লাগলে ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে মাসেহ করলেই হবে। আর যদি মাসেহ করলেও ক্ষতি হয় তাহলে মাসেহ না করলেও চলবে।

৮. হাত-পা কাটার কারণে তার উপর মোম অথবা ভেসলিন অথবা অন্য কোন ঔষধ লাগানো হয়েছে, তাহলে উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলেই হবে। ভেসলিন প্রভৃতি দূর করা জরুরী নয। পানি দেয়াও যদি ক্ষতিকারক হয় তাহলে মাসেহ করলেই হবে।

৯. জখম অথবা আঘাতের উপর ঔষধ লাগানো হলো অথবা পট্টির উপর পানি দেয়া হলো অথবা মাসেহ করা হলো। তারপর পট্টি খুলে গেল অথবা জখম ভালো হয়ে গেল, তখন ধুতেই হবে মাসেহ আর চলবে না।

যেসব জিনিসের উপর মাসেহ জায়েয নয়

১. দস্তানার উপর

২. টুপির উপর

৩. মাথার পাগড়ি অথবা মাফলারের উপর

৪. দুপাট্টা অথবা বোরকার উপর

যেসব কারণে অযু নষ্ট হয়

যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় তা দু'প্রকার ঃ-

১. যা দেহের ভেতর থেকে বের হয়।

২. যা বাহির থেকে মানুষের উপর এসে পড়ে।

প্রথম প্রকার ঃ

১. পেশাব পায়খানা বের হওয়া।

২. পায়খানার দ্বার দিয়ে বায়ু নিসঃরণ হওয়া।

৩. পেশাব পায়খানার দ্বার দিয়ে অন্য কিছু বের হওয়া, যেমন ক্রিমি, পাথর, রক্ত প্রভৃতি।

৪. দেহের কোন অংশ থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে যাওয়া।

৫. থুথু কাশি ব্যতীত বমির সাথে রক্ত পুঁজ, খাদ্য অথবা অন্য কিছু বের হলে এবং মুখ ভরে বমি হলে।

৬. মুখ ভরে বমি না হলেও বার বার হলো এবং তার পরিমাণ মুখ ভরে হওয়ার সমান তাহলে অযু নষ্ট হবে।

৭. থুথুর সাথে রক্ত এলে এবং রক্তের পরিমাণ বেশী হলে।

৮. চোখে কোন কষ্টের কারণে ময়লা বা পানি বের হয়ে যদি গড়িয়ে পড়ে তাহলে অযু নষ্ট হবে। কিন্তু যার চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ে তার জন্যে মাফ।

৯. কোন মেয়ে লোকের স্তনে ব্যথার কারণে দুধ ছাড়া কিছু পানি যদি বের হয় তাহলে অযু নষ্ট হবে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ

১. চিত হয়ে, কাত হয়ে, অথবা ঠেস দিয়ে ঘুমালে।

২. যে যে অবস্থায় জ্ঞান ও অনুভূতি থাকে না।

৩. রোগ অথবা শোকের কারণে জ্ঞান হারালে।

৪. কোন মাদকদ্রব্য সেবনে অথবা ঘ্রাণ নেয়ার কারণে নেশাগ্রস্ত হলে।

৫. জানাযা নামায ব্যতীত অন্য যে কোন নামাযে অট্টহাস্য করলে।

৬. রোগী শুয়ে শুয়ে নামায পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে।

৭. নামাযের বাইরে যদি কেউ দুজানু হয়ে বসে বা অন্য উপায়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তারপর দু'পাজর মাটি থেকে আলাদা থাকে, তাহলে অযু নষ্ট হবে।

যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় না ঃ

১. নামাযের মধ্যে এমনকি সেজদাতে ঘুমালে।

২. বসে বসে ঝিমুলে।

৩. নাবালকের অট্টহাসিতে।

৪. জানাযায় অট্টহাসিতে।

৫. নামাযে অস্ফুট শব্দে হাসলে এবং মৃদু হাস্য করলে।

৬. মেয়েলোকের স্তন থেকে দুধ বের হলে।

৭. সতর উলঙ্গ হলে, সতরে হাত দিলে, অন্যের সতর দেখলে।

৮. জখম থেকে রক্ত বের হয়ে যদি গড়িয়ে না যায়, জখমের মধ্যেই থাকে।

৯. অযুর পর মাথা বা দাড়ি কামালে অথবা নেড়ে করলে।
১০. কাশি ও থুথু বের হলে।
১১. মুখ, কান অথবা নাক দিয়ে কোন পোকা বেরুলে।
১২. শরীর থেকে কোন পোকা বেরুলে।
১৩. ঢেকুর উঠলে এমনকি দুর্গন্ধ ঢেকুর হলেও।
১৪. মিথ্যা কথা বললে, গীবত করলে এবং কোন গোনাহের কাজ করলে। (মায়াযাল্লাহ)

হাদাসে আসগারের (বেঅযুর) হুকুমসমূহ

১. হাদাসে আসগর (বেঅযু) অবস্থায় নামায হারাম, যে কোন নামায হোক।
২. সিজদা করা হারাম, তেলাওয়াতের সিজদা হোক, শোকরানার হোক অথবা এমনিই, কেউ সিজদা করুক।
৩. কোরআন পাক স্পর্শ করা মকরূহ তাহরিমি, কোরআন পাক জড়ানো কাপড় ও ফিতা হোক না কেন।
৪. কা'বার তাওয়াফ মকরূহ তাহরিমি।
৫. কোন কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক, রেক্সিন প্রভৃতি টুকরায় কোন আয়াত লেখা থাকলে তা স্পর্শ করাও মাকরূহ তাহরিমি।
৬. কুরআন পাক যদি জুযদান অথবা রুমাল প্রভৃতিতে অর্থাৎ আলাদা কাপড়ে জড়ানো থাকে তাহলে স্পর্শ করা মাকরূহ হবে না।
৭. নাবালক বাচ্চা, কিতাবাতকারী, মুদ্রাকর ও জিলদ তৈয়ারকারীর জন্যে হাদাসে আসগার অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা মকরূহ নয়। কারণ তাদের জন্যে সর্বদা হাদাসে আসগার থেকে পাক থাকা কঠিন।
৮. হাদাসে আসগার অবস্থায় কোরআন শরীফ পড়া, পড়ানো, দেখে হোক, না দেখে হোক, মুখস্থ হোক সর্বাবস্থায় জায়েয।
৯. তফসীরের এমন কিতাব যার মধ্যে কোরআনের মূল বচন আছে, অযু ছাড়া স্পর্শ করা মকরূহ।
১০. হাদাসে আসগার (বেঅযু) অবস্থায় কোরআন পাক লেখা যায় যদি যাতে লেখা হচ্ছে তা স্পর্শ করা না হয়।
১১. কোরআন পাকের তরজমা অন্য কোন ভাষায় হলে অযু করে তা স্পর্শ করা ভালো।

রোগীর জন্যে অযুর হুকুম

অযুর ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকে ব্যতিক্রম মনে করা হবে যে এমন রোগে আক্রান্ত যার শরীর থেকে সব সময় অযু ভংগকারী বস্তু বের হতে থাকে এবং রোগীর এতটা অবকাশ নেই যে তাহারাতের সাথে নামায পড়তে পারে। যেমন ঃ

১. কারো পেশাবের রোগ আছে এবং সব সময় ফোঁটা ফোঁটা পেশাব বের হয়।

২. কারো বায়ু নিঃসরণের রোগ আছে। সব সময় বায়ু নিঃসরণ হতে থাকে।

৩. কারো পেটের রোগ এবং সর্বদা পায়খানা হতে থাকে।

৪. এমন রোগী সর্বদা রক্ত বা পুঁজ বের হয়।

৫. কারো নাকশিরা রোগ আছে এবং সর্বদা নাক দিয়ে রক্ত পড়ে।

রোগীর মাসয়ালা

১. অক্ষম রোগী ব্যক্তি নয়া অযু করার পর ওয়াক্ত থাকা পর্যন্ত সে অযুতে ফরয, সুন্নত, নফল সব নামায পড়তে পারে।

২. কেউ ফজর নামাযের জন্যে অযু করলো। তারপর সূর্য উঠার পর তার অযু শেষ হয়ে গেল। এখন কোন নামায পড়তে হলে নতুন অযু করতে হবে।

৩. সূর্য উঠার পর অযু করলে সে অযুতে যোহর নামায পড়া যায়। যোহারের জন্যে দ্বিতীয়বার অযু করার দরকার নেই। তবে আসরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে এ অযু শেষ হয়ে যাবে।

৪. এ ধরনের কোন রোগীর কোন নামাযের পুরা ওয়াক্ত এমন গেল যে এসময়ের মধ্যে তার সে রোগ বিলকুল ঠিক হয়ে গেল। যেমন, কারো সব সময়ে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়তো। এখন তার যোহর থেকে আসর পর্যন্ত এক ফোঁটাও পড়লো না। তাহলে তার রোগের অবস্থা খতম হয়ে গেল। এরপর যতবার পেশাবের ফোঁটা পড়বে ততবার অযু করতে হবে।

তায়াম্মুমের বয়ান

তাহারাত (পবিত্রতা) হাসিল করার আসল মাধ্যম পানি যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ মেহেরবানীতে বান্দাদের জন্যে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে রেখেছেন। তথাপি এমন অবস্থার সৃষ্টিও হতে পারে যে, কোন স্থানে পানি পাওয়া যাচ্ছে না, অথবা পাওয়া গেলেও পানি দিয়ে তাহারাত হাসিল করা মানুষের সাধ্যের বাইরে, অথবা পানি ব্যবহারের ভীষণ ক্ষতির আশংকা রয়েছে– এসব অবস্থায় আল্লাহ

তায়ালা অতিরিক্ত মেহেরবাণী এই করেছেন যে, তিনি মাটি দিয়ে তাহারাত হাসিল করার অনুমতি দিয়েছেন। তার পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন যাতে করে বান্দাহ দ্বীনের উপর আমল করতে কোন অসুবিধা বা সংকীর্ণতার সম্মুখীন না হয়। কুরআন মাজীদে আছে–

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَايُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

(المائدة : ٦)

“আর তোমরা যদি পানি না পাও, তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও। তাতে হাত মেরে চেহারা এবং হাত দুটির উপর মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে সংকীর্ণতার মধ্যে ফেলতে চান না। বরং তিনি তোমাদেরকে পাক করতে চান এবং চান যে তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিবেন যাতে তোমরা শোকরগোযার হতে পারা।”– (মায়েদাহ ঃ ৬)

তায়াম্মুমের অর্থ

অভিধানে তায়াম্মুম শব্দের অর্থ হচ্ছে ধারণা ও ইচ্ছা করা। ফিকাহর পরিভাষায় এর অর্থ হলো মাটির দ্বারা নাজাসাতে হুকুমী থেকে পাক হওয়ার ইচ্ছা করা। তায়াম্মুম অযু এবং গোসল উভয়ের পরিবর্তে করা যায়। অর্থাৎ তায়াম্মুম দ্বারা হাদাসে আসগার এবং হাদাসে আকবার উভয় থেকেই পাক হওয়া যায়।

কি কি অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয

১. এমন এক স্থানে অবস্থান যেখানে পানি পাওয়ার কোন আশা নেই। কারো কাছে জানারও উপায় নেই এবং এমন কোন নিদর্শনও পাওয়া যায় না যে এখানে পানি পাওয়া যেতে পারে। অথবা পানি এক মাইল কিংবা আরো দূরবর্তী স্থানে আছে এবং সেখানে যেতে বা সেখান থেকে পানি আনতে ভয়ানক কষ্ট হবার কথা। এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

২. পানি আছে তবে তার পাশে শত্রু আছে অথবা হিংস্র পশু বা প্রাণী আছে, অথবা ঘরের বাইরে পানি আছে কিন্তু চোর-ডাকাতের ভয় আছে, অথবা কুয়া আছে কিন্তু পানি উঠাবার কিছু নেই, অথবা কোন মেয়ে মানুষের জন্যে বাইর থেকে পানি আনা তার ইজ্জত আবরুর জন্য ক্ষতিকারক। এমন সব অবস্থাতে তায়াম্মুম জায়েয।

৩. পানি নিজের কাছেই রয়েছে। কিন্তু পরিমাণে এতো কম যে যদি তা দিয়ে অযু বা গোসল করা হয় তাহলে পিপাসায় কষ্ট হবে অথবা খানা পাকানো যাবে না, তাহলে তায়াম্মুম জায়েয হবে।

৪. পানি আছে কিন্তু ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা আছে, অথবা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে অবশ্য কোন কুসংস্কারবশে নয়, যেমন ধরুন, কোন ব্যক্তি শীতের দিনে গরম পানি দিয়ে অযু গোসল করতে অভ্যস্থ তার অযু বা গোসলের প্রয়োজন হলো এবং পানিও আছে কিন্তু তা ঠান্ডা পানি। তার অভিজ্ঞতা আছে যে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করলে তার অসুখ হয় অথবা স্বাস্থ্যের হানি হয়। এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয। গরম পানির অপেক্ষায় নাপাক থাকা অথবা নামায কাযা করা ঠিক নয়, বরং তায়াম্মুম করে পাক হবে এবং নামায ইত্যাদি আদায় করবে।

৫. পানি পাওয়া যায় কিন্তু পানি ওয়ালা ভয়ানক চড়া দাম চায়, অথবা পানির দাম ন্যায়সঙ্গত কিন্তু অভাবগ্রস্ত লোকের সে দাম দেওয়ার সংগতি নেই, অথবা দাম দেয়ার মত পয়সা আছে। কিন্তু পথ খরচের অতিরিক্ত নেই এবং তা দিয়ে পানি কিনলে অসুবিধায় পড়ার আশংকা আছে এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

৬. পানি আছে কিন্তু এতো শীত যে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে প্রাণ যেতে পারে অথবা পক্ষাঘাত রোগ হতে পারে অথবা কোন রোগ যেমন নিউমুনিয়া প্রভৃতির আশংকা আছে, পানি গরম করার সুযোগও নেই এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ।

৭. অযু বা গোসল করলে এমন নামায চলে যাওয়ার আশংকা আছে যার কাযা নেই, যেমন জানাযা, ঈদের নামায, কসুফ ও খুসুফের নামায, তাহলে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে।

৮. পানি ঘরেই আছে কিন্তু এতো দুর্বল যে উঠে পানি নেয়ার ক্ষমতা নেই, অথবা টিউবঅয়েল চালাতে পারবে না। এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

৯. কেউ রেল, জাহাজ অথবা বাসে সফর করছে। যানবাহন ক্রমাগত চলতেই আছে এবং যানবাহনে পানি নেই, অথবা পানি আছে কিন্তু এতো ভীড় যে, তাতে অযু করা সম্ভব নয়, অথবা যানবাহন কোথাও থামলো এবং নীচে নামলে তা ছেড়ে দেয়ার আশংকা রয়েছে, অথবা কোন কারণে নীচে নামাই গেল না এমন অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

১০. শরীরে অধিকাংশ স্থানে যখম অথবা বসন্ত হয়েছে তাহলে তায়াম্মুম জায়েয।

১১. সফরে পানি সংগে আছে। কিন্তু সামনে কোথাও পানি পাওয়া না যেতে পারে যার ফলে পিপাসায় কষ্ট হবে। অথবা প্রাণ যাওয়ারই আশংকা এমন অবস্থায় পানি সংরক্ষণ করে তায়াম্মুম করা জায়েয।

তায়াম্মুমের মসনুন তরিকা

'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' বলে তায়াম্মুমের নিয়ত করবে তারপর দু'হাতের তালু একটু প্রসারিত করে ধীরে পাক মাটির উপর মারবে। বেশী ধুলাবালি হাতে লেগে গেলে ঝেড়ে নিয়ে অথবা মুখ দিয়ে ফুক দিয়ে তা ফেলে দেবে। তারপর দু'হাত এভাবে সমস্ত মুখমণ্ডলের উপরে মৃদু মর্দন করবে যাতে চুল পরিমাণ স্থান বাদ পড়ে না যায়। দাড়িতে খিলালও করতে হবে। তারপর দ্বিতীয়বার এভাবে মাটির উপর হাত মেরে এবং হাত ঝেড়ে নিয়ে প্রথমে বাম হাতের চার আঙ্গুলের মাথার নিম্নভাগ দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলের উপর থেকে কনুই পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তারপর বাম হাতের তালু কনুইয়ের উপরের অংশের উপর মর্দন করে হাতের পিঠের উপর দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং আঙ্গুলগুলোর খিলালও করবে। এভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মর্দন করবে। হাতে কোন ঘড়ি বা আংটি থাকলে তা সরিয়ে তার নীচেও মর্দন করা জরুরী।

তায়াম্মুমের ফরয

তায়াম্মুমের তিন ফরয

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে পাক হওয়ার নিয়ত করা।
২. দুহাত মাটির উপর মৃদু আঘাত করে সমস্ত চেহারার উপর মর্দন করা।
৩. তারপর দুহাত মাটির উপর মৃদু আঘাত করে বা মেরে নিয়ে কনুই পর্যন্ত দুহাত মর্দন করা।

তায়াম্মুমের সুন্নত

১. তায়াম্মুমের প্রথমে বিসমিল্লাহ্ বলা।
২. মসনুন তরিকায় তায়াম্মুম করা। অর্থাৎ প্রথমে চেহারা মাসেহ্ করা এবং তারপর দুহাত কনুই সহ মাসেহ্ করা।
৩. পাক মাটির উপর হাতের ভেতর দিক মারতে হবে, পিঠের দিক নয়।
৪. হাত ও মাটিতে মারার পর মাটি ঝেড়ে ফেলা।
৫. মাটিতে হাত মারার সময় আংগুলগুলো প্রসারিত রাখা যাতে ভেতরে ধুলা পৌঁছে যায়।
৬. অন্ততঃ পক্ষে তিন আঙ্গুল দিয়ে চেহারা ও হাত মাসেহ্ করা।
৭. প্রথম ডান হাত পরে বাম হাত মাসেহ্ করা।
৮. চেহারা মাসেহ্ করার পর দাড়ি খিলাল করা।

যেসব জিনিস দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয বা নাজায়েয

১. পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয তো বটে, উপরন্তু মাটির ধরনের সকল বস্তু

দিয়েও জায়েয। যেসব বস্তু আগুনে জ্বালালে ছাই হয়ে যায় না নরম হয়ে যায় না, মাটির মতনই, যেমন- সুরমা, চুন, ইট, পাথর, বালু, কংকর, মরমর পাথর অথবা আকীক, ফিরোজা প্রভৃতি এসব দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয।

২. ঐসব জিনিস দিয়ে তায়াম্মুম না জায়েয যা মাটির ধরনের নয়, যা আগুনে দিলে জ্বলে ছাই হয়ে যায় অথবা গলে যায়। যেমন কাঠ, লোহা, সোনা, চাঁদি, তামা, পিতল, কাঁচ, রং এবং সকল প্রকার লোহা, দ্রব্যাদি, কয়লা, খাদ্য শস্য, কাপড়, কাগজ, নাইলন, প্লাস্টিক, ছাই এসব দিয়ে তায়াম্মুম নাজায়েয।

৩. যেসব জিনিসে তায়াম্মুম নাজায়েয তার উপর যদি এতোটা ধুলাবালি জমে যায় যে হাত মারলে উড়ে যায়, অথবা হাত রেখে টানলে গাদ পড়ে। তাহলে তা দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয হবে। যেমন, কাপড়ের থানের উপর ধূলা পড়েছে, চেয়ার টেবিলে ধূলা পড়েছে, অথবা কোন মানুষের গায়ে ধুলা পড়েছে এসব দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে।

৪. যেসব জিনিস দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয, যেমন মাটি, ইট, পাথর, মাটির পাত্র প্রভৃতি। এসব যদি একেবারে ধোয়া হয় এবং তার উপর কোনরূপ ধূলাবালি না থাকে, তথাপি তা দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয হবে।

যেসব কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়

১. যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় ঐসব কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হবে। আর যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, সে কারণে অযুর বদলে কৃত তায়াম্মুম এবং গোসলের বদলে কৃত তায়াম্মুম উভয়ই নষ্ট হয়ে যায়।

২. অযু এবং গোসল উভয়ের জন্যে একই তায়াম্মুম করলে যদি অযু নষ্ট হয় তাহলে অযুর তায়াম্মুম নষ্ট হবে কিন্তু গোসলের তায়াম্মুম নষ্ট হবে না। তবে গোসল ওয়াজিব হয় এমন কোন কারণ ঘটলে গোসলের তায়াম্মুমও নষ্ট হবে।

৩. যদি নিছক পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে তাহলে পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম নষ্ট হবে।

৪. কোন ওযর অথবা রোগের কারণে যদি তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে, তারপর ওযর অথবা রোগ রইলো না, তখন তায়াম্মুম নষ্ট হবে। যেমন, কেউ ভয়ানক ঠাণ্ডার জন্যে অযু না করে তায়াম্মুম করলো, তারপর গরম পানির ব্যবস্থা হলো। তখনই তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে।

৫. পানির নিকটে কোন হিংস্র বস্তু, সাপ অথবা শত্রু থাকার কারণে অযুর বদলে তায়াম্মুম করা হয়েছে। এখন যেইমাত্র এ আশংকা দূরীভূত হবে, তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে।

৬. কেউ যদি রেল, জাহাজ অথবা বাসে ভ্রমণকালে পানির অভাবে তায়াম্মুম করে,

অতঃপর পথ অতিক্রম করার সময় পথে নদীনালা, পুকুর, ঝর্ণা প্রভৃতি দেখতে পায়। কিন্তু যেহেতু চলন্ত গাড়ী বা জাহাজ পানি ব্যবহার করার কোনই সুযোগ নেই, সে জন্যে তার তায়াম্মুম নষ্ট হবে না।

৭. কোন ব্যক্তি কোন একটি ওযরের কারণে তায়াম্মুম করলো। ঐ ওযর শেষ হলো কিন্তু দ্বিতীয় একটি ওযর সৃষ্টি হলো। তথাপি প্রথম ওযর শেষ হওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে গেল। যেমন ধরুন, পানি না পাওয়ার জন্যে কেউ তায়াম্মুম করলো। কিন্তু পরে পানি পাওয়ার সাথে সাথেই সে এমন অসুস্থ হয়ে পড়লো যে পানি ব্যবহার তার পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি তার প্রথম তায়াম্মুম শেষ হয়ে যাবে যা পানি না পাওয়ার কারণে করা হয়েছিল।

৮. কেউ অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করেছিল। তারপর অযু করার পরিমাণ পানি পেয়ে গেল। তখন তার তায়াম্মুম চলে গেল। কেউ যদি গোসলের পরিবর্তে অর্থাৎ হাদাসে আকবার থেকে পাক হওয়ার জন্যে তায়াম্মুম করলো তারপর এতটুকু পানি পেলো যে তার দ্বারা শুধু অযু হতে পারে কিন্তু গোসল হবে না। তাহলে গোসলের তায়াম্মুম নষ্ট হবে না।

তায়াম্মুমের বিভিন্ন মাসয়ালা

১. কেউ পানির অভাবে তায়াম্মুম করলো এবং নামায পড়লো। নামায শেষে পানি পেয়ে গেল। এ পানি ওয়াক্তের মধ্যে পেয়ে গেলেও নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে না।

২. পানির অভাবে অথবা কোন রোগ বা অক্ষমতার কারণে যখন মানুষ তায়াম্মুমের প্রয়োজন বোধ করে। তখন নিশ্চিত মনে তায়াম্মুম করে দীনি ফারায়েয আদায় করবে। এ ধরনের কোন প্ররোচনা যেন তাকে পেরেশোন না করে যে শুধু পানির মধ্যমেই পাক হওয়া যায়, তায়াম্মুমের দ্বারা কি হবে। পাক নাপাকের ব্যাপার পানি বা মাটির উপর নির্ভর করে না আল্লাহর হুকুমের উপর নির্ভর করে। আর আল্লাহর শরীয়ত যখন মাটি দ্বারা পাক হয়ে নামাযের অনুমতি দিয়েছে, তখন বুঝতে হবে যে তায়াম্মুমের দ্বারাও তেমন তাহারাত হাসিল করা যায় যা গোসলের দ্বারা করা যায়।

৩. কেউ যদি মাঠে ময়দানে পানির তালাশ করে তায়াম্মুম করে নামায পড়লো। তারপর জানা গেল যে নিকটেই পানি ছিল। তথাপি তায়াম্মুম এবং নামায উভয়ই দুরস্ত হবে। অযু করে নামায দুহরাবার দরকার নেই।

৪. সফরে যদি অন্য কারো নিকটে পানি থাকে এবং মনে হয় যে চাইলে পাওয়া

যাবে, তাহলে চেয়ে নিয়ে অযুই করা উচিত। আর যদি মনে হয় যে চাইলে পাওয়া যাবে না, তাহলে তায়াম্মুম করাই ঠিক হবে।

৫. অযু এবং গোসল উভয়ের পরিবর্তে তায়াম্মুম দুরস্ত আছে। অর্থাৎ হাদাসে আসগার এবং হাদাসে আকবার উভয় থেকে পাক হওয়ার জন্য তায়াম্মুম করা দুরস্ত আছে এবং তায়াম্মুমের পদ্ধতি তাই যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। দুইয়ের জন্যে আলাদা তায়াম্মুমেরও দরকার নেই। একই তায়াম্মুম উভয়ের জন্যে যথেষ্ট। যেমন, এক ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়েছে। সে তায়াম্মুম করলো। এখন এ তায়াম্মুমে সে নামাযও পড়তে পারবে। অযুর জন্য আলাদা তায়াম্মুমের দরকার নেই।

৬. তায়াম্মুমে এ বাধ্যবাধকতা নেই যে এক তায়াম্মুমে একই ওয়াক্তের নামায পড়তে হবে। বরঞ্চ যতোক্ষণ তা নষ্ট না হয়, ততোক্ষণ কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়তে পারবে। এভাবে ফরয নামাযের জন্যে যে তায়াম্মুম করা হবে তা দিয়ে ফরয, সুন্নত, নফল, জানাযা, সিজদায়ে তেলওয়াত আদায় করতে পারবে। কিন্তু শুধু কুরআন পাক স্পর্শ করার জন্য, মসজিদে প্রবেশ করার জন্য, কোরআন তেলাওয়াতের জন্যে অথবা কবরস্থানে যাওয়ার জন্য যে তায়াম্মুম করা হয় তার দ্বারা নামায প্রভৃতি পড়া দুরস্ত হবে না।

৭. পানি আছে কিন্তু অযু বা গোসল করতে গেলে নামাযে জানাযা, ঈদের নামায, কসূপ ও খসুফের নামায প্রভৃতি পাওয়া যাবে না, তাহলে এ অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামাযে শরীক হওয়া জায়েয। কারণ অন্য সময়ে এসব নামাযের কাযা হয় না।

৮. কেউ যদি অক্ষম হয় এবং নিজ হাতে তায়াম্মুম করতে না পারে, তাহলে অন্য কেউ তাকে মসনুন তরিকায় তায়াম্মুম করিয়ে দেবে। অর্থাৎ তার হাত মাটিতে মেরে প্রথমে চেহারা পরে হাত ঠিকমতো মুছে দেবে।

৯. কারো নিকটে দুটি পাত্রে পানি আছে, একটিতে পাক পানি অন্যটিতে নাপাক পানি। এখন তার জানা নেই কোনটিতে পাক কোনটিতে নাপাক পানি। এ অবস্থায় তার তায়াম্মুম করা উচিত।

১০. মাটির একটি ঢিলে একই জন কয়েকবার তায়াম্মম করতে পারে। ঐ একটি ঢিলে কয়েক জনের তায়াম্মুমও জায়েয। যে মাটিতে তায়াম্মুম করা হয় তার হুকুম মায়ে মুস্তামালের (ব্যবহৃত পানির) মতো নয়।

নামাযের অধ্যায়

ঈমানের পর ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামায। এই ছিল উচিত যে আকায়েদের অধ্যায়ের পরেই নামাযের হুকুম ও মাসয়ালা বয়ান করা হোক। কিন্তু যেহেতু নামায আদায় করার জন্য সকল প্রকার নাজাসাত থেকে পাক হওয়া অপরিহার্য, সে জন্য, তাহারাতের বিশদ বিবরণের পর নামাযের হুকুম ও মাসয়ালা বয়ান করা হচ্ছে।

নামাযের অর্থ

নামায আমাদের নিকট একটি সুপরিচিত শব্দ। কুরআনের পরিভাষা সালাত। সালাতের ফারসী হলো নামায যা বাংলা ভাষাও ব্যবহৃত হয় । সালাতের (صلوٰة) আভিধানিক অর্থ কারো দিকে মুখ করা, অগ্রসর হওয়া, দোআ করা এবং নিকটবর্তী হওয়া। কুরআনের পরিভাষায় নামাযের অর্থ হলো আল্লাহর দিকে মনোযোগ দেয়া, তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া, তাঁরই কাছে চাওয়া এবং তাঁর একেবারে নিকটবর্তী হওয়া। এ ইবাদত পদ্ধতির আরকানের শিক্ষা কুরআন দিয়েছে এবং তার বিস্তারিত ও খুটিনাটি পদ্ধতি নবী পাক (সঃ) শিখিয়ে দিয়েছেন।

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

(الاعراف : ٢٩) -

এবং প্রত্যেক নামাযে নিজের দৃষ্টি ঠিক আল্লাহর দিকে রাখ এবং আন্তরিক আনুগত্যের সাথে তাঁকে ডাকো (আ'রাফঃ ১৯)

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (العلق : ١٩)

এবং সিজদা কর, আল্লাহর নিকটবর্তী হও । (আলাক ঃ ১৯)

হাদিসে আছে ঃ বান্দাহ ঐ সময়ে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, যখন সে আল্লাহর সামনে সিজদায় থাকে। (মুসলিম)

– তোমাদের মধ্যে যখন কেউ নামাযে রত হয়, তখন সে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে। (বোখারী)

কিন্তু আল্লাহর দিকে মনোযোগ দেয়া, তাঁর নিকটবর্তী হওয়া এবং তাঁর কাছে চাওয়ার তরিকা কি? তার একটি মাত্র উত্তরই সঠিক। তা ছাড়া আর যতো উত্তর তা

সব ভুল এবং পথ ভ্রষ্টকারী। নবী (সঃ) যে তরিকা বলে দিয়েছেন তাই হচ্ছে সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য। নামাযের আরকান, নামাযের আহকাম, সময়, রাকায়াতাদি এবং বিস্তারিত পদ্ধতি নবী (সঃ) শুধু মুখ দিয়েই শিক্ষা দেন নি, বরঞ্চ সারাজীবন তার উপর আমল করে দেখিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর কথা ও আমল হাদীসের অতি নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে সংরক্ষিত আছে। এ নিয়ম পদ্ধতিতে হরহামেশা গোটা উম্মত নামায আদায় করে সকল রকম সন্দেহ থেকে একে পবিত্র রেখেছেন।

নামাযের ফযিলত ও গুরুত্ব

ঈমান আনার পরে একজন মুসলমানের কাছে সবচেয়ে প্রথম দাবী এই যে সে নামায কায়েম করবে। আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হচ্ছে ঃ-

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَآاِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ -

(طه : ١٤)

"নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব শুধু আমারই বন্দেগী কর এবং আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম কর।" (তাহা ঃ ১৪)

আকায়িদের ব্যাপারে যেমন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান দীনের উৎস, তেমনি আমলের ব্যাপারে নামায হচ্ছে গোটা দীনের আমলের ভিত্তি। এটাই কারণ যে কুরআন পাকে সকল ইবাদতের মধ্যে নামাযের সবচেয়ে বেশী তাকীদ করা হয়েছে। এবং তা কায়েম করার উপরে এত জোর দেয়া হয়েছে যে তার উপরেই যেন গোটা দীন নির্ভরশীল।

নামায ব্যতীত অন্যসব ইবাদত বিশেষ বিশেষ লোকের উপর বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য ফরয হয়। যেমন হজ্ব এবং যাকাত শুধু ঐসব মুসলমানের উপর ফরয যারা সম্পদের অধিকারী। রোযা বছরে শুধু একমাস ফরয। কিন্তু নামায এমন এক আমল যার জন্য ঈমান ছাড়া আর কোন শর্ত নেই। ঈমান আনার সাথে সাথেই প্রত্যেক বালেগ ও জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের উপর নামায ফরয হয়। সে নারী হোক বা পুরুষ হোক, আমীর হোক বা ফকীর হোক, স্বাস্থ্যবান হোক অথবা রোগী এবং মুকীম হোক বা মুসাফির। দিনে পাঁচবার নামায ফরযে আইন। এমনকি সশস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যখন দুশমনের মোকাবিলার প্রতি মুহূর্তে আশংকা হয়, ঠিক তখনও নামায শুধু ফরযই নয়, বরঞ্চ জামায়াতে পড়ার তাকীদ আছে। সালাতে খওফের নামাযও আদায় করার পদ্ধতি স্বয়ং কুরআনে বয়ান করা হয়েছে।

নামাযের তাকীদ ও প্রেরণার সাথে সাথে তার গুরুত্ব মনে বদ্ধমূল করার জন্যে

কুরআনে ভয়ানক পরিনাম এবং বিরাট লাঞ্ছনার এমন ভয় দেখানো হয়েছে, যা নামায পরিত্যাগকারীগণ ভোগ করবে।

নবী (সঃ) নামাযের অসাধারণ গুরুত্ব ও ফজিলত এবং তা ত্যাগ করার ভয়ানক শাস্তির উপর বিভিন্ন ভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন -

-ঈমান এবং কুফরের মধ্যে নামাযই পার্থক্যকারী। (মুসলিম)

- যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে নামায পড়বে, কেয়ামতের দিন সে নামায তার জন্য নূর এবং ঈমানের প্রমাণ হবে এবং নাজাতের কারণ প্রমাণিত হবে। – (মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী)

একবার নবী পাক (সঃ) সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তোমাদের মধ্যে কারো ঘরের পাশ দিয়ে কোন নদী প্রবাহিত হয় যার মধ্যে সে দৈনিক পাঁচ বার -গোসল করে, তাহলে বল, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কিনা? সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেন, না তার শরীরে কোন ময়লাই থাকবে না। নবী (সঃ) বললেন, এ অবস্থা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের। আল্লাহ তায়ালা এসব নামাযের বদৌলতে তার গোনাহগুলো মিটিয়ে দেবেন। (বুখারী-মুসলিম)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী পাকের (সঃ) জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বের হয় নামায, নামায। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

দীনের মধ্যে নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত জানার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের এসব সুস্পষ্ট তাকীদসহ হেদায়েতের সাথে সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে স্বয়ং নবী পাকের (সঃ) নামাযের সাথে কত গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি নামাযে চোখের শীতলতা অনুভব করতেন। ছোটখাটো কারণেও এতো বেশী বেশী নফল নামায পড়তেন যে তাঁর পা ফুলে যেত।

যা হোক কুরআন ও সুন্নাতের এসব বিশদ বিবরণের পর এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, নামায ঈমানের এক অপরিহার্য নিদর্শন। ঈমান হলে সেখানে অবশ্যই নামায হবে এবং যেখানে নামায হবে সেখানে গোটা দীন আছে বুঝতে হবে। যদি নামায না থাকে তাহলে সেখানে দীনের অস্তিত্ব ধারণা করা যায় না।

নামায কায়েমের শর্ত ও আদব

উপরে যে ফযিলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো তা কিন্তু ঐ নামাযের যা সত্যিকার অর্থে নামায, যে নামায সকল বাহ্যিক আদব লেহায ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে পূর্ণ অনুভূতির সাথে আদায় করা হয়। এ জন্য কুরআন নামায আদায়

করার জন্য আদায় করার মতো সাদাসিদে প্রকাশভংগী অবলম্বন করার পরিবর্তে ইকামাত (প্রতিষ্ঠা করণ) এবং মুহাফেযাত (সংরক্ষণ) শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। ইকামত ও মুহাফেযাতের অর্থ এই যে নামায আদায় করতে গিয়ে ঐসব প্রদর্শনমূলক আদব লেহাযের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যার সম্পর্ক নামাযের বাহ্যিক দিক ঠিক করার সাথে সাথে ঐসব অপ্রকাশ্য গুণাবলীরও পুরোপুরি ব্যবস্থা করতে হবে যার সম্পর্ক নামাযীর অন্তর ও তার আবেগ অনুভূতির সাথে জড়িত।

নিম্নে সংক্ষেপে এসব আদব (শিষ্টাচার) ও গুণাবলী বর্ণনা করা হলো।

১. তাহারাত বা পবিত্রতা

শরীয়ত পবিত্রতার যে পদ্ধতি ও হুকুমাবলী শিক্ষা দিয়েছে। তদানুযায়ী শরীর ও কাপড় ভালভাবে পাক সাফ করে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا (المائده : ٦)

“ঈমানদারগণ, জেনে রাখ যে যখন তোমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত দুটি হাত ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবে, মাথা মাসেহ করবে এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেলবে। আর যদি জানাবাতের অবস্থায় থাক, তাহলে খুব ভালো করে পাক সাফ হয়ে যাবে।” (মায়েদা ঃ ৬)

অন্য স্থানে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (المدثر : ٤)

– এবং তোমার লেবাস পোশাক ভালো করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক করে নাও। (মুদ্দাসসির ঃ ৪)

২. সময়ের নিয়মানুবর্তিতা

অর্থাৎ ঠিক সময়ে নামায আদায় করতে হবে। এজন্য নামায সময়নিষ্ঠার সাথে ফরয করা হয়েছে।

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ـ

অতএব নামায কায়েম কর। বস্তুতঃ নামায মুমিনদের উপর সময়নিষ্ঠার সাথে ফরয করা হয়েছে। (নিসা ঃ ১০৩)

নবী (সঃ) বলেন ঃ সর্বোৎকৃষ্ট বান্দাহ তারাই যারা সূর্যের রোদ এবং চাঁদ ও তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে যাতে করে নামাযের সময় বয়ে না যায়। (মুস্তাদরাকে হাকিম)

৩. নামাযের সময়নিষ্ঠা

অর্থাৎ কোন নামায নষ্ট না করে ক্রমাগত হরহামেশা নামায পড়তে হবে। প্রকৃতপক্ষে নামাযী তাদেরকে বলা যেতে পারে যারা সময়নিষ্ঠার সাথে এবং কোন নামায বাদ না দিয়ে নামায আদায় করে।

اِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلاَتِهِمْ دَائِمُوْنَ (المعارج ٢٢-٢٣)

কিন্তু ঐসব নামায আদায়কারী যারা সময়নিষ্ঠার সাথে সর্বদা নামায আদায় করে। (মায়ারিজ ঃ ২২-২৩)

৪. কাতার বন্দীর ব্যবস্থাপনা

নামাযের কাতার সোজা রাখার রীতিমত ব্যবস্থা করতে হবে। নামাযের কাতার দুরস্ত করা ভালোভাবে নামায পড়ার অংশ।

হযরত নুমান বিন বশীর বলেন, নবী (সঃ) আমাদের কাতার সোজা রাখার এমন ব্যবস্থা করতেন যেন তার দ্বারা তিনি তীরের লক্ষ্য সোজা করবেন। অতঃপর তিনি অনুভব করতেন যে, আমরা কাতার সোজা করার গুরুত্ব বুঝে ফেলেছি। আর একদিন তিনি বাইরে তাশরিফ আনলেন এবং নামায পড়াবার জন্যে দাঁড়ালেন। তিনি তাকবীর বলতে যাবেন এমন সময় তাঁর নজর এমন এক ব্যক্তির উপর পড়লো যার বুক কাতার থেকে একটুখানি সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দাহ, কাতার সোজা রাখ। নতুবা আল্লাহ তোমাদের মুখ একে অপরের বিরুদ্ধে করে দেবেন। (মুসলিম)

–নামাযের মধ্যে কাতার সোজা কর। কারণ কাতার সোজা করা ইকামাতে সালাতের অংশ বিশেষ। (বুখারী)

অর্থাৎ কাতার দুরস্ত না করলে নামায পড়ার হক ভালেভাবে আদায় হয় না।

কাতার সোজা ও বরাবর রাখার সাথে সাথে কাতারবন্দীর ব্যবস্থাও করতে হবে। অর্থাৎ বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইমামের নিকটবর্তী থাকবেন। এটা তখনই সম্ভব যখন আহলে ইলম লোকদের প্রতি সমাজের শ্রদ্ধাবোধ জাগবে এবং

তাঁদের নিজেদেরও বিশিষ্ট মর্যাদার অনুভূতি থাকতে হবে এবং আগেভাগেই মসজিদে হাজির হয়ে ইমামের নিকট স্থান করে নেবেন।

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) নামাযে এসে আমাদের কাতার সোজা করার জন্য আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলতেন, সোজা হও, কাতার বরাবর কর, আগে পিছে হয়ো না। তা না হলে তোমরা একে অপরের প্রতি নারাজ হয়ে পড়বে। তিনি আরও বলতেন, যারা জ্ঞানবুদ্ধি রাখে তারা আমার নিকটে দাঁড়াবে, তারপর তারা যারা মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের নিকটে, তারপর তারা যারা জ্ঞানবুদ্ধির দিক দিয়ে দ্বিতীয় দলের নিকটবর্তী। (বুখারী শরীফ)

৫. মনের প্রশান্তি ও মধ্যবর্তীতা

অর্থাৎ নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে থেমে থেমে নামায আদায় করা দরকার যাতে কিরাআত, কিয়াম, রুকু, সিজদাহ ও নামাযের যাবতীয় রুকন প্রভৃতির হক আদায় করা যায়।

وَلَاتَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً -

নামায না বেশী আওয়াজ করে আর না একেবারে অল্প আওয়াজে পড়বে। বরং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করবে। (বনী- ইসরাঈল ঃ১১০)

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একবার নবী পাক (সঃ) মসজিদের একধারে বসে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে এলো এবং নামায পড়লো। তারপর নবী (সঃ)-এর কাছে এলেন এবং সালাম করলেন। নবী (সঃ) সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আবার গিয়ে নামাজ পড়, তুমি ঠিকমতো নামায পড় নি। সে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়ে এসে নবীকে সালাম করলো। নবী বললেন, আবার গিয়ে নামায পড়, তোমার নামায ঠিক হয় নি। সে ব্যক্তি তৃতীয়বার নামায পড়ে অথবা তারপর আরজ করলো, হে আল্লাহর রসূল, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন কিভাবে নামায পড়বো। নবী (সঃ) বললেন, যখন তুমি নামায পড়ার ইরাদা কর তখন প্রথমে খুব ভালোভাবে অযু কর। তারপর কিবলার দিকে মুখ কর। তারপর তাকবীরে তাহরিমা বলে নামায শুরু কর এবং কুরআনের যে অংশ সহজে পড়তে পার তা পড়। (কোন বর্ণনায় আছে, সুরায়ে ফাতেহা পড় এবং তারপর যা চাও পড়)। তারপর তুমি প্রশান্ত মনে রুকুতে যাও। তারপর রুকু থেকে একবারে সোজা হয়ে দাড়াও। তারপর প্রশান্ত মনে সিজদাহ কর এবং সিজদাহ থেকে প্রশান্ত মনে সোজা হয়ে বস। পুরা নামায এভাবে নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত মনে আদায় কর। (বুখারী ও মুসলিম)

নবী পাক (সঃ)-এর উপরোক্ত হেদোয়েতের মর্ম এই যে, নামায মাথার কোন বোঝা

নয় যে মাথা থেকে কোন রকমে নামিয়ে ফেললেই হলো এবং তাড়াহুড়া করে নামায শেষ করলো। বরং এ হচ্ছে আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত। তার হক এই যে, পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে তার সকল আরকান আদায় করবে, ধীরে ধীরে থেমে থেমে মনোযোগ দিয়ে পড়বে। যে নামায প্রশান্ত মনে পড়া হয় না, নবী পাক (সঃ)-এর নিকটে তা নামাযই নয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী (সঃ)-এর নামাযের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "নবী (সঃ) তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করতেন এবং 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' থেকে কুরআন পড়া শুরু করতেন। যখন তিনি রুকুতে যেতেন তখন মাথা না উপরে উঠিয়ে রাখতেন আর না নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখতেন, বরং মধ্যম অবস্থায় অর্থাৎ কোমর বরাবর সোজা রাখতেন, তারপর যখন রুকু' থেকে উঠতেন তখন যতক্ষণ না সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, ততোক্ষণ সিজদায় যেতেন না। তারপর প্রথম সিজদা থেকে যখন মাথা উঠাতেন তখন যতক্ষণ না একেবারে সোজা হয়ে বসতেন, দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। প্রতি দু'রাকায়াত পর 'আত্তাহিয়াতু' পড়তেন। 'আত্তাহিয়াতু' পড়ার সময় বাম পা বিছিয়ে রাখতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন এবং শয়তানের মতো বসতে নিষেধ করতেন। অন্য রেওয়াতে আছে, কুকুরের মতো বসতে নিষেধ করতেন। তিনি এভাবে সিজদা করতেও নিষেধ করেন যেভাবে হিংস্র পশু সামনের দু'পা বিছিয়ে বসে। তারপর তিনি- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে নামায শেষ করতেন" (মুসলিম)

৬. জামায়াতে নামাযের ব্যবস্থাপনা

ফরয নামায অবশ্যই জামায়াতে পড়তে হবে। অবশ্য যদি জান মালের ক্ষতির আশংকা না থাকে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ (البقرة : ٤٣)

রুকু'কারীদের সাথে মিলে রুকু' কর। (বাকারাহ ঃ৪৩)

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ (النساء : ١٠٢)

এবং (হে নবী,) যখন আপনি মুসলমানদের সাথে থাকবেন তখন তাদের নামায পড়িয়ে দিবেন। (নিসা ঃ ১০২)

এ হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে নামায আদায় করা সম্পর্কে নির্দেশ। এ নাযুক

পরিস্থিতিতেও যুদ্ধের সৈনিকগণ আলাদা আলাদা নামায পড়বে না। বরং নবী (সঃ) নামায পড়িয়ে দিবেন। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা নবী (সঃ) -এর পেছনে জামায়াতে নামায পড়বেন।

নবী (সঃ) বলেন -

"যে ব্যক্তি জামায়াতে নামাযের জন্যে মুয়াযযিনের আযান শুনলো এবং তার আহ্বানে সাড়া দিতে তার কোন ওজরই নেই, তথাপি সে জামায়াতে নামাযের জন্য গেলো না, একাকী নামায পড়লো, তা হলে সে নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, 'ওজরের' অর্থ কি? তিনি বললেন, জান-মালের আশংকা অথবা রোগ"। (আবু দাউদ)

৭. কুরআন তিলাওয়াতে তারতীল ও চিন্তাভাবনা

নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের হক আদায় হয় যদি তা পড়া হয় একটু থেমে থেমে, আন্তরিকতা এবং মনোযোগ বা মনের উপস্থিতি সহকারে এবং অতি আগ্রহের সাথে। তারপর এক এক আয়াতের উপর চিন্তাভাবনা করতে হবে। নবী পাক (সঃ) এক একটি অক্ষর সুস্পষ্ট করে এবং এক এক আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন।

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً (المزمل : ٤)

এবং কুরআন একটু থেমে থেমে পড়ুন। (মুজ্জাম্মিল ঃ ৪)

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ - (ص : ٢٩)

এ কিতাব আপনার উপর নাযিল করেছি এবং তা বরকতপূর্ণ এ জন্য যে মানুষ যেন তার আয়াতগুলোর উপর চিন্তাভাবনা করে এবং জ্ঞানবান তার থেকে শিক্ষা লাভ করে। (সোয়াদ ঃ ২৯)

৮ . আগ্রহ ও মনোযোগ

প্রকৃত নামায তাকেই বলে যার মধ্যে লোক মনমস্তিষ্ক, আবেগ, অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনার সাথে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর দিকে মনোযোগ দেয় এবং তার সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর কাছে চাওয়ার আগ্রহ এমন বেশী হয় যে এক নামায আদায় করার পর দ্বিতীয় নামাযের প্রতীক্ষায় অন্তর অধীর হয়ে থাকে।

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (الاعراف : ٢٩)

প্রত্যেক নামাযের জন্যে নিজের কিবলা ঠিক রাখ এবং তাঁকে (আল্লাহকে) ডাক ও আনুগত্য দাসত্ব তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে দাও। (আরাফ ঃ ২৯)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ـ (الجمعه : ٩)

হে মুমিনগণ ! যখন জুমার দিনের নামাযের জন্যে ডাকা হয়, তখন সকল কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর যিকিরের দিকে দৌড়াও। (জুময়া ঃ ৯)

৯. শিষ্টাচার ও আত্মসমর্পণ

অর্থাৎ একজন অনুগত গোলামের মত নামাযী লোক অতিশয় বিনয় ও আত্মসমর্পনের প্রতীক হিসাবে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াবে যেন অন্তর আল্লাহর মহত্ব ও পরাক্রমে প্রকম্পিত হতে থাকে এবং অংগ প্রত্যংগেও যেন বিনয় নম্রতার ছাপ পরিস্ফুট হয়।

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ কর, বিশেষ করে সর্বোৎকৃষ্ট নামাযের এবং আল্লাহর সামনে শিষ্টাচার ও আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়াও। (বাকারাহ ঃ ২৩৮)

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ (الحج : ٣٤)

এবং (হে নবী) সুসংবাদ দিন ঐসব লোকদেরকে যারা বিনয় ও শিষ্টাচার অবলম্বন করে এবং যাদের অবস্থা এই যে যখন তারা আল্লাহর যিকির শুনে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। বিপদে আপদে অটল অচল হয়ে ধৈর্যধারণ করে এবং নামায কায়েম করে। (হজ্ব ঃ ৩৪-৩৫)

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَاتَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ (الاعراف : ٢٠٥)

এবং আপনার রবকে সকাল সন্ধ্যায় স্মরণ করুন মনে মনে বিনয় বিগলিত হয়ে, এবং তাঁর ভয়ে এবং অনুচ্চস্বরে এবং গাফেলদের মধ্যে শামিল যেন না হন। (আ'রাফ ঃ ২০৫)

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রঃ) যখন নামাযের জন্যে অযু করতেন তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। ঘরের লোকজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন ওযুর সময় আপনার একি অবস্থা হয়? তিনি বলতেন তোমরা জাননা আমি কোন সত্তার সামনে দাঁড়াতে চাই? (ইহইয়াউল উলুম)

১০. বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ও নম্রতা নামাযের প্রাণ। যে নামাযের বিনয় ও নম্রতা নেই সে নামায, নামায নয়। কুরআনে 'খুশু' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ ছোট হওয়া, দমিত হওয়া, নম্রতার সাথে ঝুঁকে পড়া। নামাযে এ খুশু অবলম্বন করার অর্থ এই যে, শুধু শরীরই নয় বরং মনমস্তিষ্ক সব কিছুই আল্লাহর সামনে হীন ও দীন হয়ে ঝুঁকে যাওয়া বা অবনত হওয়া। মনের মধ্যে আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব এমন ভয় সঞ্চার করে যে, মন্দ আবেগ অনুরাগ ও অবাঞ্ছিত চিন্তাভাবনা মনে আসতে পারে না। শরীরের উপরও তার ছাপ পড়ে। এমন এক অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ হবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর মহত্ব ও পরাক্রমের উপযোগী। আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ -

ঐসব মুমিন কল্যাণ লাভ করেছে যারা তাদের নামাযে বিনয় নম্র। (আল-মুমিনুন ঃ ১-২)

১১. আল্লাহর নৈকট্যের অনুভূতি

নামায মানুষকে আল্লাহর এতটা নিকটবর্তী করে দেয় যে অন্য কোন আমল দ্বারা এতোটা নিকটবর্তী হওয়ার ধারণা করা যেতে পারে না। নবী (সঃ) বলেন, বান্দাহ ঐ সময় তার আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হয়ে যায় যখন সে সিজদায় থাকে। (মুসলিম)

ইকামাতে সালাতে গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত এই যে, নামাযীর মনে যেন এ নৈকট্যের অনুভূতি হয়। তার অন্তরে এ নৈকট্যের কামনা-বাসনা থাকে এবং সে এমনভাবে নামায পড়ে যেন আল্লাহকে দেখছে অথবা নিদেন পক্ষে এ অনুভূতি হয় যে আল্লাহ তাঁকে দেখছেন।

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ - (العلق : ١٩)

এবং সিজদা কর ও তাঁর নিকটবর্তী হয়ে যাও। (আলাক ঃ ১৯)

১২. আল্লাহর ইয়াদ (স্মরণ)

নামাযের সত্যিকার গুণই হলো আল্লাহর ইয়াদ বা স্মরণ। আর আল্লাহর ইয়াদের সার্বিক এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নামায। এ জন্য যে, এ হচ্ছে তাঁরই শেখানো পদ্ধতি যাঁর স্মরণ কাম্য। যে নামায আল্লাহর স্মরণের গুণ থেকে খালি তা মুমিনের নামায নয়, মুনাফিকের নামায। নামায কায়েমের উদ্দেশ্যই তো হচ্ছে আল্লাহকে ইয়াদ (স্মরণ) করা।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ـ (طه : ١٤)

এবং নামায কায়েম করুন আমাকে ইয়াদ করার জন্যে। (তাহা ঃ ১৪)

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ ـ (السجدة : ١٥)

(মনে রাখতে হবে এ আয়াত সিজদার আয়াত)

আমাদের আয়াতের উপরে তো প্রকৃতপক্ষে তারাই ঈমান আনে, যাদেরকে এসব আয়াতের দ্বারা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলে সিজদায় পড়ে যায় এবং নিজেদের প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা বয়ান করতে থাকে এবং তারা গর্ব অহংকার করে না। (আস্-সাজদা ঃ ১৫)

অর্থাৎ তাদের রুকু' সিজদা অনুভূতির রুকু' সিজদা হয়। তারা বেপরোয়া হয়ে শুধু মুখে তসবিহ পাঠ করে না, বরঞ্চ যেসব কালেমাই উচ্চারণ করে তা আল্লাহর স্মরণই করে এবং তাদের নামায সরাসরি আল্লাহর হয়।

১৩. রিয়া থেকে দূরে থাকা

নামায রক্ষণাবেক্ষণের একটি বড় শর্ত এই যে, তা অহংকার, লোক দেখানো, প্রদর্শনী অথবা অন্যান্য নীচতাপূর্ণ প্রবণতা থেকে দূরে রাখা হবে। নইলে তা হবে আন্তরিকতার পরিপন্থী, অহংকার দ্বারা শুধু নামায নষ্টই হয়ে যায় না, বরঞ্চ এ ধরনের নামাযীও ধ্বংস হয়।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ـ

ধ্বংস ঐ সব নামাযীদের জন্যে যারা তাদের নামায থেকে গাফেল হয় এবং মানুষকে দেখাবার জন্যে নামায পড়ে। (মাউন ঃ ৪)

হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) বয়ান করেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাবার জন্যে নামায পড়ে, সে শিরক করলো। (মুসনাদে আহমদ)

১৪. পূর্ণ আত্মসমর্পণ

ইকামাতে সালাতের শেষ এবং সার্বিক শর্ত এই যে, মুমিন নামাযে তার নিজকে পুরাপুরি তার আল্লাহর উপর সপে দিবে। যতোদিন সে জীবিত থাকবে আল্লাহর অনুগত গোলাম হয়ে থাকবে এবং যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হবে তখন মৃত্যুও হবে আল্লাহর জন্য। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ - لَاشَرِیْكَ لَهٗ - وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ -

অবশ্য অবশ্যই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং এ জন্যই আমাকে আদেশ করা হয়েছে। এবং আমি সকলের প্রথমে নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণকারী। (আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)

আয়াতটিতে একটি বিশেষ ক্রমানুসারে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। নামায এবং কুরবানি, তারপর নামাযের সাথে জীবন এবং কুরবানির সাথে মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নামায এবং কুরবানি দুটি সার্বিক বিষয় যা মুমিনের গোটাজীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। নামায আসলে এ সত্যেরই প্রতিফলন যে, মুমিন শুধু নামাযেই নয় বরং নামাযের বাইরে তার গোটা জীবনেই একমাত্র আল্লাহর অনুগত বান্দাহ। কুরবানী এ সত্যেরই বহিঃপকাশ যে মুমিনদের জান-মাল সব কিছুই আল্লাহর পথে কুরবান হবার জন্যেই তার কাছে গচ্ছিত আছে।

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের সাথে যে নামায পড়া হয়, তা হবে প্রকৃত নামায। গোটা জীবনের উপর তা এমন প্রভাব বিস্তার করবে যে একদিকে নামাযী ব্যক্তি অনাচার অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে অত্যন্ত সজাগ থাকবে– অনাচার করা তো দূরের কথা তার চিন্তা করতেও ঘৃণা আসবে এবং অপরদিকে ভালো কাজ করার জন্য বরং সবচেয়ে ভাল কাজ করার জন্য উৎসাহী ও তৎপর হবে।

ইকামাতে সালাতের হক পুরাপুরি আদায় করার এবং নামাযকে সত্যিকার নামায বানাবার জন্যে উপরের চৌদ্দটি শর্ত মেনে চলতে হবে। সেই সাথে তাহাজ্জুদ অন্যান্য নফল নামায এবং যিকির আযকারেরও নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে যা

মাসনুন। উপরন্তু বিভৃত স্থানে সর্বদা আত্মসমালোচনা ও অশ্রু সিক্ত হয়ে বিনয়াবনত হৃদয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করার অভ্যাসও করতে হবে।

নামায ফরয হওয়ার সময়কাল

নামায তো নবী (সঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) শুরু থেকেই পড়তেন। তবে পাঁচ ওয়াক্তের নামায শবে মি'রাজে ফরয করা হয়। হিজরতের এক বছর পূর্বে নবী পাক (সঃ) মিরাজের মর্যাদা লাভ করেন এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজির হন। এ সময়ে এ নামায উপহার দেয়া হয়। তারপর হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে তাকে নামাযের সময় এবং পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। নামায যে ফরয তা কুরআনে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে এবং সকল ইবাদতের মধ্যে নামাযের জন্যে বেশী বেশী তাকীদ করা হয়েছে। নামায ফরয এ কথা যে অস্বীকার করে সে নিশ্চয়ই মুসলমান নয়।

নামায ফরয হওয়ার শর্ত

নামায-ফরয হওযার শর্ত পাঁচটি। তার মধ্যে কোন একটি শর্ত পাওয়া না গেলে নামায ফরয হবে না।

১. ঈমান। অর্থাৎ নামায মুসলমানের উপর ফরয কাফেরের উপর নয়।

২. বালেগ হওয়া। যতোক্ষণ না বালক বালিকা সাবালক হবে, ততোক্ষণ তাদের উপর নামায ফরয হবে না।

৩. হুঁশজ্ঞান থাকা। যদি কেউ পাগল হয় অথবা বেহুশ হয় অথবা সব সময়ে বেহুঁশ থাকে তার উপর নামায ফরয হবে না।

৪. নামাযের ওয়াক্ত হওয়া। অর্থাৎ নামাযের এতোটা সময় পেতে হবে যেন পড়া যায় অথবা অন্ততঃপক্ষে এতটুকু সময় পেতে হবে যে পাক সাফ হয়ে তাকবীরে তাহরিমা বলা যায়। যদি উপরের চারটি শর্ত পাওয়া যায় কিন্তু নামাযের এতটুকু সময় পাওয়া না যায়, তাহলে সে ওয়াক্তের নামায ফরয হবে না।

নামাযের সময়

নামাযের সময় নিয়মানুবর্তিতার সাথে ফরয করা হয়েছে। ফরয নামাযগুলোর সময় কোরআন ও সুন্নত বিশ্লেষণ মুতাবিক পাঁচটি, যথা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব এবং এশা।

ফজরের ওয়াক্ত

সুবহে সাদিক হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকে।

যোহরের ওয়াক্ত

সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর শুরু হয়। সময় তখন পর্যন্ত থাকে যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার আসল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হয়।

যেমন, এক হাত লম্বা একটা দণ্ডের আসল ছায়া দুপুর বেলা চার আঙ্গুল ছিল। তারপর সে দন্ডের ছায়া যখন দু'হাত চার আঙ্গুল হবে, তখন যোহরের ওয়াক্ত চলে যাবে। কিন্তু সাবধানতার জন্যে যোহরের নামায এমন সময়ের মধ্যে পড়া উচিত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার আসল ছায়া বাদে তার সমান হয়। জুমার নামাযেরও এই সময়। তবে গরমের সময় একটু বিলম্বে পড়া ভালো। কিন্তু জুমার নামায সকল ঋতুতে প্রথম সময়ে পড়াই উত্তম।

আসরের ওয়াক্ত

যোহরের ওয়াক্ত শেষ হলেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় পর্যন্ত থাকে। অবশ্যি সূর্যে হলুদ বর্ণ এসে যাওয়ার পূর্বে আসরের নামায পড়া উচিত। হলুদ বর্ণ আসার পর নামায মাকরূহ হয়। কোন কারণে যদি আসরের নামায বিলম্ব হয়ে যাওয়ার কারণে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে, তাহলে নামায কাযা না করে তখনই পড়ে নেওয়া উচিত।

মাগরিবের ওয়াক্ত

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং পশ্চিমাকাশের লাল রং শেষ হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে। মাগরিবের সময় হওয়ার সাথে সাথে পড়া মুস্তাহাব।

এশার ওয়াক্ত

পশ্চিমাকাশের লাল বর্ণের পর সাদা বর্ণ চলে যাওয়ার পর শুরু হয় এবং সুবেহ সাদিক পর্যন্ত বাকী থাকে। পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ সূর্যাস্তের আনুমানিক সোয়া ঘন্টা পর অন্ধকারে ঢেকে যায়। কিন্তু এশার নামায সাবধানতার জন্যে দেড় ঘন্টা পর পড়া উচিত।

এসব ফরয নামায ছাড়াও তিন ধরনের নামায ওয়াজিব। নিম্নে সেসবের ওয়াক্ত বলা হলো। **বিতেরের নামাযের ওয়াক্ত**

এশার নামাযের পরেই বিতের পড়া উচিত। অবশ্যি যারা নিয়মিতভাবে শেষ রাতে উঠতে অভ্যস্ত তাদের জন্যে শেষ রাতে পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু যদি সন্দেহ হয় যে কি জানি যদি ঘুম না ভাঙে তাহলে মুস্তাহাব এই যে, এশার নামাযের পরেই তা পড়ে নিতে হবে।

দু'ঈদের নামাযের ওয়াক্ত

যখন সূর্যোদয়ের পর তার হলুদ বর্ণ শেষ হওয়ার পর রৌদ্র তেজোদীপ্ত হয়ে পড়ে তখন দু'ঈদের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং বেলা পড়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে সর্বদা ঈদের নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব।

নামাযের এ সময়গুলো সারা বিশ্বের জন্যে

নামাযের সময় নির্ধারনের যে নিয়ম উপরে বলা হলো তা দুনিয়ার সকল দেশের জন্য। যেখানে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় রাত ও দিন ছোট হোক অথবা বড় হোক, নামাযের সময় সেখানে উপরোক্ত নিয়মেই নির্ধারিত করতে হবে।

মেরু প্রদেশগুলোর নিকটবর্তী ভূখণ্ডে যেখানে রাত ও দিনের মধ্যে অসাধারণ দূরত্ব হয় সেখানে নামাযের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা মওদূদী (রঃ) একটি প্রশ্নের জবাবে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খণ্ড থেকে প্রশ্ন ও উত্তর উদ্ধৃত করা হলো।

মেরু অঞ্চলদ্বয়ের নিকটবর্তী দেশগুলোতে নামায-রোযার সময়

প্রশ্ন - আমার এক ছেলে ট্রেনিং উপলক্ষ্যে ইংল্যান্ডে আছে। সে রোযার সময়সূচীর জন্যে মৌলিক নিয়ম পদ্ধতি জানতে চায়। বৃষ্টি, বাদল, কুয়াশা প্রভৃতির কারণে সেখানে সূর্য খুব কমই দেখা যায়। দিন কখনো খুব বড়, কখনও খুব ছোট হয়। তাহলে এমন অবস্থায় বিশ ঘন্টা বা বেশী সময় রোযা রাখতে হবে?

উত্তর - যে সব দেশে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূর্য উদয় হয় ও অস্ত যায়, তা সেখানে রাত ছোট অথবা বড় হোক সেখানে নামাযের সময় ঠিক ঐ নিয়মে নির্ধারণ করতে হবে যা কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফজরের নামায সূর্যোদয়ের আগে, যোহর বেলা গড়ার পর, আসর সূর্যাস্তের আগে এবং এশা রাত কিছুটা অতীত হওয়ার পর। এভাবে রোযা সুবহে সদিক হওয়ার সময় থেকে শুরু হবে এবং সূর্যাস্তের পর পরই ইফতার করতে হবে। যেখানে যোহর এবং আসরের মধ্যে অথবা মাগরিব এবং এশার মধ্যে সময় ক্ষেপন সম্ভব নয়, সেখানে দু'ওয়াক্তের নামায একসাথে পড়বে। আপনার ছেলে যেন তার সুবিধামতো আবহাওয়া অফিস থেকে জেনে নেয় যে, সেখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত কখন হয় এবং বেলা পড়ে কখন। সে অনুযয়ী নামাযের সময় ঠিক করে নেবে।

রোযার সময়ে ওখানকার দিন বড় হওয়ার জন্যে ঘাবড়াবার দরকার নেই। ইবনে বতুতা রাশিয়ার বুলগেরিয়া শহর সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন গ্রীষ্মকালে পৌঁছেন তখন রমযান মাস ছিল। সেখানে ইফতারের সময় নিয়ে সুবেহ সাদিক পর্যন্ত মাত্র দু'ঘন্টা সময় পাওয়া যায়। এ অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে মুসলমানগণ ইফতারও করে, খানাও খায় এবং এশার নামাযও পড়ে। এশার নামাযের কিছুক্ষণ পরেই সুবহে সাদিক হয়ে যায়। তারপর ফজরের নামায পড়ে।

নামাযের রাকায়াতসমূহ

ফজরের নামায

প্রথমে দু'রাকায়াত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। তারপর দু'রাকায়াত ফরয নামায। হাদীসগুলোতে ফজরের সুন্নাতের জন্য খুব তাকীদ করা হয়েছে। যদিও নবী (সঃ) অন্যান্য সুন্নাতের জন্যেও তাকীদ করেছেন কিন্তু সবচেয়ে বেশী ফজরের সুন্নাতের জন্য করেছেন। নিজেও তিনি এ ব্যপারে খুব বেশী যত্নশীল ছিলেন। তিনি বলেছেন, ফজরের সুন্নাত কিছুতেই ছাড়বে না যদিও ঘোড়া তোমাদেরকে পদদলিত করে।(আহমদ, আবু দাউদ)

তিনি আরও বলেন, ফজরের সুন্নাত আমার কাছে দুনিয়া ও তার যাবতীয় সম্পদ থেকে বেশী প্রিয়। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

সুন্নাত নামাযগুলোর মধ্যে নবী পাক (সঃ) ফজরের সুন্নাতের যতো পাবন্দি করতেন, অন্য কোন নামাযের সুন্নাতের ব্যাপারে এতটা করতেন না। হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) ফজরের সুন্নাত আমার ঘরে পড়তেন এবং হালকা পড়তেন। ফজরের সুন্নাতে তিনি প্রথম রাকায়াতে قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরা পড়তেন।

যোহরের নামায

প্রথমে চার রাকায়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ (এক সালামসহ), তারপর চার রাকায়াত ফরয। তারপর দু'রাকায়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং তারপর দু'রাকায়াত নফল।

জুমার নামায

প্রথমে চার রাকায়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ (এক সালামসহ), তারপর দুরাকায়াত ফরজ জামায়াতসহ, তারপর চার রাকায়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এক সালামসহ।

আসরের নামায

প্রথমে চার রাকায়াত সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ অথবা মুস্তাহাব, তারপর চার রাকায়াত ফরয।

মাগরিব

প্রথমে তিন রাকায়াত ফরয। তারপর দুরাকায়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, তারপর দু'রাকায়াত নফল।

এশা

প্রথমে চার রাকায়াত সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ, তারপর চার রাকায়াত ফরয, তারপর দু'রাকায়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, তারপর তিন রাকায়াত বিতর, তারপর দু'রাকায়াত নফল।

আযান ও ইকামাতের বয়ান

আযান ও ইকামাতের অর্থ

আযানের অর্থ সাবধান করা, অবহিত করা, ঘোষণা করা। শরীয়তের পরিভাষায় জামায়াতে নামাযের জন্য– মানুষ জমায়েত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু শব্দের মাধ্যমে ডাক দেয়া এবং ঘোষণা করার নাম আযান। আযানের প্রচলন হওয়ার পূর্বে ওয়াক্ত অনুমান করে মানুষ স্বয়ং মসজিদে হাজির হতো এবং জামায়াতে নামায পড়তো। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা যখন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকা বহু সংখ্যক লোক মুসলমান হওয়া শুরু করে, তখন অনুভব করা হলো যে, নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়া হোক। অতএব হিজরী প্রথম বছরে নবী (সঃ) আযানের পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন।

ইকামাতের অর্থ হলো দাঁড় করানো। ইসলামী পরিভাষা হিসাবে জামায়াত শুরু হওয়ার আগে আযানের কথাগুলো পুনরায় বলা এবং এ কথা ঘোষণা করা যে, জামায়াত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এ জন্য ইকামাতে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এরপর قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলা হয় অর্থাৎ নামায দাঁড়িয়ে গেছে বা মানুষ নামাযের জন্যে দাঁড়িয়েছে।

আযান ও ইকামাতের মাসনুন তরিকা (পদ্ধতি)

আযানের মাসনুন তরিকা হচ্ছে এই যে, মুয়ায্যিন (আযানদানকারী) পাক সাফ হয়ে কোন উঁচু স্থানে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং দুই কানের মধ্যে শাহাদত অংগুলিদ্বয় প্রবেশ করিয়ে উঁচু গলায় নিম্নের কথাগুলো বলবে ঃ-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ সব চেয়ে বড়) - চার বার।

اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) - দু'বার।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসূল) – দু'বার।

حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (এসো নামাযের দিকে) – দু'বার।

حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ (এসো কল্যাণ ও সফলতার দিকে) – দু'বার

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ সব চেয়ে বড়) – দু'বার।

لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) – একবার।

ইকামাতের সময় ঐ কথাগুলোই ততোবার করে বলতে হবে। শুধু পার্থক্য এই যে, এ কথাগুলো নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় বলতে হবে। আর حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ এর পর দু'বার قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলবে।

উল্লেখ্য যে, ফজরের আযানে حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ -এর পর অতিরিক্ত বলতে হবে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (ঘুম থেকে নামায উত্তম) –দু'বার।

আযানের জবাব ও দোয়া

১. যে ব্যক্তিই আযান শুনতে পাবে তার জন্যে জবাব দেয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ- মুয়াযযিন যা বলবে তাই বলতে হবে। তবে حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ বলার পর বলতে হবে لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

নবী (সঃ) বলেন, যখন মুয়াযযিন বলবে اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে اَللّٰهُ اَكْبَرُ তারপর মুয়াযযিন যখন বলবে اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এবং জবাবদানকারী বলবে اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ তারপর মুয়াযযিন যখন বলবে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهُ এবং জবাবদানকারী বলবে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهُ তারপর মুয়াযযিন

যখন বলবে حَیَّ عَلَی الصَّلٰوةِ এবং জবাবদানকারী বলবে لَاحَوْلَ وَلَاقُـوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ তারপর মুয়াযযিন যখন বলবে اَللّٰهُ اَكْبَـرُ এবং জবাবদানকারী বলবে اَللّٰهُ اَكْبَـرُ তারপর মুয়াযযিন যখন বলবে لَااِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ এবং জবাবদানকারী বলবে لَااِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ তখন যে ব্যক্তি আযানের জবাবে এ কথাগুলো বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

২. ফজরের আযানের সময় যখন মুয়াযযিন اَلصَّلٰوةُ خَیْـرٌ مِّنَ النَّوْمِ (ঘুম থেকে নামায উত্তম) বলবে, তখন শ্রোতা বলবে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ (তুমি সত্য কথাই বলেছ এবং মঙ্গলের কথা বলেছ)।

৩. আযান শুনার পর দরূদ শরীফ পড়বে। আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) এর বর্ণনা, নবী (সঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন আযান শুনবে, তখন মুয়াযযিন যা বলবে তা সে নিজেও বলবে এবং আমার উপর দরূদ পড়বে। কারণ যে আমার উপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। এর ভিত্তিতে ওলামায়ে কেরাম বলেন, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ প্রথমবার শুনে একবার صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْكَ یَانَبِیَّ اللّٰهِ বলা মুস্তাহাব (ইলমুল ফিকাহ্, ২য় খণ্ড)।

৪. আযান শুনার পর নিম্নের দোয়া পড়বে। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনার পর এ দোয়া পড়বে সে আমার শাফায়াতের হকদার হবে (বুখারী)।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِیْلَةَ وَالْفَضِیْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِیْ وَعَدْتَّهُ

(بخاری)

হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ দাওয়াত ও আসন্ন নামাযের তুমিই মালিক, মুহাম্মদকে (সা:) 'অসিলা' দান কর, ফযিলত দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানের উপর অধিষ্ঠিত কর যার ওয়াদা তুমি করেছ। (বুখারী)

'দাওয়াতে তাম্মাহ' এর মর্ম হলো তাওহীদের এ আহ্বান যা পাঁচ বার প্রত্যেক

মসজিদ থেকে ধ্বনিত হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। 'অসিলার' মর্ম হচ্ছে জান্নাতে আল্লাহর নৈকট্যের সেই মর্যাদা যা শুধু নবী (সঃ) লাভ করবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ-

যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মুয়াযযিনের আযান শুনবে। তখন নিজেও তা বলবে, তারপর আমার উপর দরূদ পাঠাবে। (কারণ যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠাবে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন)। তারপর সে আল্লাহর কাছে আমার জন্যে 'অসিলা' চাইবে। এ হচ্ছে জান্নাতে এমন এক মর্যাদা যা আল্লাহর কোন খাস বান্দার জন্য নির্দিষ্ট। আমি আশা করি সে বান্দাহ আমিই হবো। যে ব্যক্তি আমার 'অসিলার' জন্যে দোয়া করবে তার শাফায়াত করা আমার ওয়াজিব হয়ে যাবে (মুসলিম)।

৫. ইকামাতের জবাব দেয়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

৬. কয়েকটি আযানের শব্দ কানে এলে মাত্র একটির জবাবই যথেষ্ট হবে। প্রত্যেক আযানের পৃথক পৃথক জবাবের দরকার নেই।

৭. জুমার দিনে খুৎবার আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়, মকরূহ নয়, বরঞ্চ মুস্তাহাব। (ইলমুল ফিকাহ)

আযান ও মুয়াযযিনের রীতি পদ্ধতি

১. আযান পুরুষকে দিতে হবে। মেয়েলোকের আযান ঠিক হবে না। কোন ওয়াক্ত মেয়েলোক আযান দিলে তা পুনরায় দিতে হবে।

২. এমন লোকের আযান দিতে হবে যে শরীয়তের জরুরী মাসয়ালা সম্পর্কে অবহিত, নেক এবং পরহেজগার হয়। আওয়াজ উচ্চ হওয়া ভালো।

৩. জ্ঞানী ও বিবেকবান লোকের আযান দেয়া উচিত। পাগল এবং হুশ কম এমন ব্যক্তির আযান মাকরূহ। এরূপ অবুঝ বালকের আযানও মাকরূহ।

৪. আযান মসজিদের বাইরে কোন উচ্চস্থানে কিবলামুখী হয়ে দেয়া উচিত। অবশ্য জুমার দ্বিতীয় আযান যা খুৎবার আগে দেয়া হয়, তা মসজিদের মধ্যে মাকরূহ নয়।

৫. আযান দাঁড়িয়ে থেকে দিতে হবে। বসে বসে আযান দেয়া মাকরূহ।

৬. আযান বলার সময় দু'হাতের শাহাদাত অংগুলি কানের ছিদ্রের মধ্যে দেয়া মুস্তাহাব।

৭. আযানের শব্দগুলো থেমে থেমে এবং ইকামত অনর্গল বলা সুন্নাত। আযানের

কথাগুলো এমনভাবে দম নিয়ে নিয়ে বলতে হবে যেন শ্রোতা জবাব দিতে পারে।

৮. আযানে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময় ডান দিকে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ। বলার সময় বাম দিকে মুখ ফেরানো সুন্নাত। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে বুক এবং পায়ের পাতা কিবলার দিক থেকে ফিরে না যায়।

আযান ও ইকামাতের মাসয়ালা

১. 'ফরযে আইন' নামাযের জন্যে আযান সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, তা ওয়াক্তের নামায হোক বা কাযা নামায, নামায পাঠকারী মুকীম হোক অথবা মুসাফির সকল অবস্থায় আযান সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। অবশ্যি সফরের অবস্থায় যখন জামায়াতে যোগদানকারী সকল সাথী উপস্থিত থাকে তাহলে আযান মুস্তাহাব হবে, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নয়।

২. নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দিতে হবে। পূর্বে আযান দিলে তা ঠিক হবে না। সময় হলে দ্বিতীয়বার আযান দিতে হবে তা যে কোন সময়ের আযান হোক না কেন।

৩. আযান আরবী ভাষার এবং ঐসব শব্দমালায় বলতে হবে যা নবী (সঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় আযান দেয়া জায়েয হবে না এবং নবী (সঃ)-এর শিখানো কথাগুলো বাদ দিয়ে অন্য কোন শব্দাবলী দিয়ে নামাযের জন্যে ডাকা জায়েয হবে না। এসব অবস্থায় মানুষ আযান বুঝতে পেরে জমায়েত হলেও আযান ঠিক হবে না। মাসনুন তরীকায় আরবী ভাষায় আযান একান্ত জরুরী।

৪. আযান সব সময়ে জ্ঞানবান, বালেগ এবং পুরুষকে দিতে হবে। স্ত্রীলোকের আযান মাকরূহ তাহরিমী। এমনি পাগল ও নেশাগ্রস্ত লোকের আযানও মাকরূহ। অবুঝ বালকের আযানও মকরূহ। কোন সময় মেয়েলোক, অথবা কোন পাগল বা কোন অবুঝ বালক আযান দিলে পুনরায় তা দিতে হবে।

৫. যেসব মসজিদে জামায়াতসহ নিয়মিত নামাযের ব্যবস্থাপনা আছে এবং নিয়ম মাফিক আযানও ইকামতের সাথে জামায়াত হয়ে গেছে, সেখানে দ্বিতীয়বার আযান ও ইকামত দিয়ে জামায়াত করা মকরূহ। তবে যদি কোন মসজিদে নিয়ম মাফিক জামায়াতের ব্যবস্থাপনা না থাকে, না সেখানে কোন নির্দিষ্ট ইমাম আছে আর না মুয়াযযিন, তাহলে সেখানে পুনরায় আযান ও একামত দিয়ে নামায পড়া মকরূহ নয় বরং ভালো।

৬. ফরযে আইন নামায ব্যতীত অন্য নামাযে, যেমন জানাযা, ঈদ, ওয়াজিব ও নফল নামাযে আযান দেয়া ঠিক নয়।

৭. আযান দেয়ার সময় কথা বলা অথবা সালামের জবাব দেয়া দুরস্ত নয়। যদি হঠাৎ কেউ সালামের জবাব দেয় তো ঠিক আছে। কিন্তু তারপর কথাবলা শুরু করলে পুনরায় আযান দিতে হবে।

৮. জুমার প্রথম আযান শুনার সাথে সাথেই সকল কাজ ছেড়ে মসজিদে যাওয়া ওয়াজিব। আযান শুনার পর কাজে রত থাকা এবং ব্যবসা পুরোদমে করা হারাম।

৯. যখন কারো কানে আযান ধ্বনি পৌঁছুবে, সে পুরুষ বা নারী, অযুসহ হোক বা বেঅযুতে হোক, তার উচিত আযানের প্রতি মনোযোগ দেয়া। যদি পথ চলা অবস্থায় হয় তাহলে দাঁড়িয়ে পড়া মুস্তাহাব। আযান হওয়াকালে তার জবাব দেয়া ব্যতীত অন্য কোন কাজে রত হওয়া ঠিক নয়। না সালাম দেবে, আর না তার জবাব। কুরআন পড়তে থাকলে তা বন্ধ করতে হবে।

১০. যে ব্যক্তি আযান দেয়, ইকামাত দেয়ার হক তার। যদি সে আযান দিয়ে কোথাও চলে যায়, অথবা স্বয়ং চায় যে অন্য কেউ ইকামতে দিক, তাহলে তার ইকামাত দুরস্ত হবে।

১১. মুয়াযযিনকে যে মসজিদে ফরয পড়তে হবে, তাকে আযান সে মসজিদেই দিতে হবে। দুই মসজিদে এক ফরয নামাযের জন্যে আযান দেয়া মকরূহ।

১২. কয়েক মুয়াযযিনের এক সাথে আযান দেয়াও জায়েয।

১৩. বাচ্চা পয়দা হলে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামতে দেয়া মুস্তাহাব।

আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব কিন্তু পাঁচ অবস্থায় না দেয়া উচিত

১. নামায অবস্থায়।

২. খুৎবা শুনার সময়, তা জুমার হোক বা অন্য কোন খুৎবা।

৩. ইলমে দ্বীন পড়া এবং পড়াবার সময়।

৪. পেশাব পায়খানার অবস্থায়।

৫. খানা খাওয়ার অবস্থায়।

নামাযের ফরযসমূহ

নামায সহীহ্ বা সঠিক হওয়ার জন্যে এমন তেরটি[১] জিনিসের প্রয়োজন যার একটি ছুটে গেলে নামায হবে না। এ তেরটি জিনিসকে নামাযের ফারায়েয বা ফরযসমূহ বলে। এ সবের মধ্যে সাতটি নামাযের পূর্বে ফরয যাকে শর্তসমূহ বা শারায়েত বলে। বাকী ছয়টি নামাযের ভেতরে ফরয বা জরুরী যাকে নামাযের আরকান বা স্তম্ভসমূহ্ বলে।

নামাযের শর্তাবলী

নামাযের শর্ত সাতটি। যদি তার মধ্য থেকে একটিও বাদ থাকে তাহলে নামায হবে না। এসব শর্তকে নামাজের আহকামও বলা হয়।

১. শরীর পাক হওয়া

অর্থাৎ শরীরের উপর যদি কোন হাকিকী নাজাসাত লেগে থাকে তাহলে তা শরীয়তের হেদায়েত মুতাবিক দূর করতে হবে। যদি অযুর দরকার হয়, অযু করতে হবে। গোসলের দরকার হলে গোসল করতে হবে। শরীর যদি নাজাসাতে হাকিকী ও হুকমী থেকে পাক না হয়, নামায হবে না।

২. পোশাক পাক হওয়া

অর্থাৎ যে কাপড় পরিধান করে অথবা গায়ে দিয়ে নামায পড়া হবে তা পাক হওয়া জরুরী। জামা, পায়জামা, টুপি, পাগড়ি, কোট, শিরওয়ানি, চাদর, কম্বল, মুজা, দস্তানা, মোট কথা নামাযীর গায়ে যা কিছুই থাকবে তা পাক হওয়া জরুরী। নতুবা নামায হবে না।

৩. নামাযের স্থান পাক হওয়া

অর্থাৎ নামায আদায়কারীর দু'পায়ের হাটু, হাত ও সিজদার স্থান পাক হওয়া জরুরী। তা খালি যমীন হোক, অথবা যমীনের উপর বিছানা হোক, মুসাল্লা প্রভৃতি যা-ই হোক। নামায সহীহ্ হওয়ার জন্য যদিও এতটুকু স্থান পাক হওয়া জরুরী, তথাপি এমন স্থানে নামায পড়া ঠিক নয় যার পাশে মলমূত্র আছে এবং তার থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

---

১. লেখক চৌদ্দটি ফরযের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নামাযের আরকান ৬টির ক্ষেত্রে ৭টি লিখেছেন। তিনি 'ইচ্ছাকৃত কাজ দ্বারা নামায শেষ করা' শিরোনামে ৭ম একটি আরকান উল্লেখ করেছেন, যা প্রসিদ্ধ নয়। (সংকলক)

৪. সতর ঢাকা

অর্থাৎ শরীরের ঐসব অংশ আবৃত রাখা, যা আবৃত রাখা নারী-পুরুষের জন্য ফরয। পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয। নারীর জন্য হাতের তালু, পা এবং চেহারা ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ফরয। পা খোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, টাখনু যেন বের হয়ে না পড়ে। কারণ নারীদের টাখনু ঢেকে রাখা জরুরী।

৫. নামাযের ওয়াক্ত হওয়া

অর্থাৎ যে নামাযের যে সময়, সে সময়ের ভেতরেই নামায পড়তে হবে। ওয়াক্ত আসার পূর্বে যে নামায পড়া হবে তা হবে না এবং ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পরে পড়লে তা কাযা নামায হবে।

৬. কিবলামুখি হওয়া

অর্থাৎ কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়া। কোন সত্যিকার কারণ অথবা অসুস্থতা ব্যতিরেকে কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে যদি কেউ নামায পড়ে, তাহলে সে নামায হবে না।

৭. নিয়ত করা

অর্থাৎ যে ফরয নামায পড়তে হবে, সেই নির্দিষ্ট নামাযের জন্যে মনে মনে ইচ্ছাপোষণ করা। যদি কোন ওয়াক্তের কাযা নামায পড়তে হয় তাহলে এই ইচ্ছা করতে হবে যে, অমুক দিনের অমুক ওয়াক্তের কাযা নামায পড়ছি। অবশ্যি নফল ও সুন্নাতের জন্য নফল অথবা সুন্নাত নামায পড়ছি- এতটুকু বলাই যথেস্ট হবে। মনের ইরাদা বা ইচ্ছা প্রকাশের জন্য মুখেও বলা ভালো কিন্তু জরুরী নয়। যদি ইমামের পেছনে নামায পড়তে হয় তাহলে তারও নিয়ত করা জরুরী।

নামাযের আরকান

নামাযের ভিতরে যেসব জিনিস ফরয তাকে আরকান বলে। নামাযের আরকান ছয়টি।

১. তাকবীরে তাহরিমা

অর্থাৎ নামায শুরু করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা যার দ্বারা আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করা হয়। এ তাকবীরের পর চলাফেরা, খানাপিনা, কথাবার্তা সব কিছু হারাম হয়ে যায় বলে একে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা হয়।

২. কিয়াম

অর্থাৎ নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। নামাযে এতটুকু সময় দাঁড়িয়ে থাকা ফরজ যে

সময়ে সেই সমপরিমাণ কোরআন পড়া যায় যা পড়া ফরয। উল্লেখ থাকে যে এ 'কিয়াম' শুধু ফরয এবং ওয়াজিব নামাযে ফরয। সুন্নাত-নফল নামাযে 'কিয়াম' ফরয নয়।

৩. কিরাআত

অর্থাৎ নামাযে কমপক্ষে এক আয়াত পড়া, আয়াত বড় হোক বা ছোট হোক। কিন্তু সে আয়াত অন্ততঃ দুটি শব্দে গঠিত হতে হবে। যেমন اَللّٰهُ الصَّمَدُ কিন্তু আয়াতে যদি একই শব্দ হয়, যেমন ق – ص – مُدْهَامَّتَانِ তাহলে ফরয আদায় হবে না।[১]

ফরয নামাযগুলোতে শুধু দু'রাকায়াতে কিরাআত ফরয তা প্রথম দু'রাকায়াতে হোক, শেষ দু'রাকায়াতে হোক মাঝের দু'রাকায়াতে হোক অথবা প্রথম ও শেষ রাকায়াতে হোক সকল অবস্থায় ফরয আদায় হয়ে যাবে। বিতর, সুন্নাত এবং নফলের সকল রাকায়াতে কিরাআত ফরয।

৪. রুকু'

প্রত্যেক রাকায়াতে একবার রুকু করা ফরয। রুকু'র অর্থ হলো নামাযী এতটা সামনের দিকে ঝুকে পড়ে যেন তার দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছে।

৫. সিজদা

প্রতি রাকায়াতে দু'সিজদাহ্ ফরয।

৬. কা'দায়ে আখিরাহ্

অর্থাৎ নামাযের শেষ রাকায়াতে এতক্ষণপর্যন্ত বসা যাতে اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ থেকে عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ পর্যন্ত পড়া যায়।

নামাযের ওয়াযিবসমূহ

নামাযের ওয়াজিব বলতে ঐসব জরুরী বিষয় বুঝায় যার মধ্যে কোন একটি ভুলবশতঃ ছুটে গেলে সিজদায়ে সহু দ্বারা নামায-দুরস্ত হয়। ভুলবশত: কোন জিনিস ছুটে যাওয়ার পর যদি সিজদায়ে সহু করা না হয় অথবা ইচ্ছা করে কোন জিনিষ ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে পুনরায় নামায পড়া ওয়াজিব হয়ে যায়। নামাযের ওয়াজিব চৌদ্দটি।

---

১. এ হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (র.) এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর অভিমত এই যে ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত পড়া ফরয।

১. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকায়াতে কিরাআত পড়া।

২. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকায়াতে এবং বাকী নামাযগুলোর সমস্ত রাকায়াতে সুরায়ে ফাতেহা পড়া।

৩. সূরা ফাতিহা পড়ার পর ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকায়াতে এবং ওয়াজিব সুন্নাত ও নফল নামাযের সকল রাকায়াতে অন্য কোন সূরা পড়া তা গোটা সূরা হোক, বড় এক আয়াত হোক অথবা ছোট তিন আয়াত হোক।

৪. সূরা ফাতেহা অন্য সূরার প্রথমে পড়া। যদি কেউ প্রথমে অন্য সূরা পড়ার পর সূরা ফাতেহা পড়ে তাহলে ওয়াজিব আদায় হবে না।

৫. কিরাআত, রুকু', সিজদাহ এবং আয়াতগুলোর মধ্যে ক্রম ঠিক রাখা।

৬. 'কাওমা' করা। অর্থাৎ রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৭. জলসা করা। অর্থাৎ দু'সিজদার মাঝে প্রশান্ত মনে সোজা হয়ে বসা।

৮. তা'দীলে আরকান। অর্থাৎ রুকু এবং সিজদা প্রশান্ত মনে ভালভাবে আদায় করা।

৯. কা'দায়ে উলা। অর্থাৎ তিন এবং চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকায়াতের পর اَلتَّحِيَّاتُ পড়ার পরিমাণ সময় বসা।

১০. উভয় কা'দায় একবার আত্তাহিয়াতু পড়া।

১১. ফজরের উভয় রাকায়াতে, মাগরিব এবং এশার প্রথম দু'রাকায়াতে, জুমা ও ঈদের নামাযে, তারাবিহ এবং রমযান মাসে বিতরের নামাযে ইমামের উচ্চস্বরে কিরাআত করা। যোহর ও আসরের নামাযে এবং মাগরিব ও এশার শেষ রাকায়াতগুলোতে আস্তে কিরায়াত করা।

১২. নামায اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ দ্বারা শেষ করা।

১৩. বিতর নামাযে দোয়া কুনূতের জন্যে তাকবির বলা এবং দোয়া কুনূত পড়া।

১৪. দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলা।

নামাযের সুন্নতসমূহ

নবী (সঃ) নামাযের মধ্যে ফরয এবং ওয়াজিব ছাড়াও অন্য কতকগুলো জিনিসও করেছেন কিন্তু সেসবের এমন কোন তাকীদ তিনি করেছেন বলে প্রমাণিত নেই- যেমন ফরয এবং ওয়াজিবের বেলায় রয়েছে। এগুলোকে নামাযের সুন্নত বলা হয়।

যদিও এগুলো ছুটে গেলে নামায নষ্ট হয় না এবং সহু সেজদাও অপরিহার্য হয় না, তথাপি এগুলো মেনে চলা উচিত। কারণ নবী (সঃ) এগুলোকে মেনে চলেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে নামায তো তাই যা নবী (সঃ)-এর নামাযের সদৃশ।

নামাযের সুন্নত একুশটি

১. তাকবীরে তাহরিমা বলার আগে পুরুষের কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত এবং নারীর কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠানো। ওজর বশতঃ পুরুষ কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠাতে না পারলে সহীহ হবে।

২. তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় দুহাতের আঙ্গুলগুলো খুলে রাখা এবং দু'হাত এবং আঙ্গুলগুলো কিবলা মুখি করা।

৩. তাকবীরে তাহরিমা বলার পরক্ষণেই পুরুষের নাভীর উপর এবং মেয়েদের বুকের উপর হাত বাঁধা। হাত বাঁধার মাসনুন তরিকা এই যে, ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে এবং ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল এবং ছোট আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে। আর বাকি তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর বিছিয়ে রাখবে। এ তরিকা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য। অবশ্যি দু'আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা নারীদের জন্যে সুন্নাত নয়।

৪. তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় মস্তক অবনত না করা।

৫. ইমামের জন্যে তাকবীরে তাহরিমা এবং এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাবার সময় তাকবীর জোরে বলা।

৬. সানা পড়া। অর্থাৎ 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' শেষ পর্যন্ত পড়া।

৭. أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পড়া।

৮. প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতেহার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া।

৯. ফরয নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকায়াতে শুধুমাত্র সূরা ফাতেহা পড়া।

১০. আমিন বলা। ইমামও আমিন বলবে এবং একাকী নামায পাঠকারীও আমিন বলবে। যেসব নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কেরাআত পড়বে, তাতে সূরা ফাতেহা শেষ হওয়ার পর সকল মুক্তাদী আমিন বলবে।

১১. সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং আমিন আস্তে পড়বে।

১২. কিরাআতে মাসনুন তরিকা অনুসরণ করা। যে যে নামাযে যতখানি কোরআন পড়া সুন্নাত সেই মুতাবেক পড়া।

১৩. রুকু এবং সিজদায় অন্ততঃপক্ষে তিনবার তসবিহ পড়া। অর্থাৎ রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ এবং সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى পড়া।

১৪. রুকুতে মাথা এবং কোমর সটান সোজা রাখা এবং দুহাতের আঙ্গুল দিয়ে উভয় হাঁটু ধরা।

১৫. কাওমায় (রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায়) ইমামের سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলা এবং মুক্তাদীর رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ,বলা।

১৬. সিজদায় যাবার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর দু'হাত, তারপর নাক এবং তারপর কপাল রাখা।

১৭. জালসা এবং কা'দায়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা এমনভাবে খাড়া রাখা যেন আঙ্গুলগুলোর মাথা কিবলার দিকে থাকে। দু'হাত হাঁটুর উপর রাখা।

১৮. আত্তাহিয়্যাতুতে 'লা-ইলাহা' বলার সময় শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা।

১৯. শেষ কা'দায় আত্তাহিয়্যাতুর পর দরূদ পড়া।

২০. দরূদের পর কোন মাসনুন দোয়া পড়া।

২১. প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফেরানো।

যেসব কারণে নামায নষ্ট হয়

যে সব কারণে নামায নষ্ট হয় তা চৌদ্দটি। নামায রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তা স্মরণ রাখা জরুরী।

১. নামাযে কথা বলা। অল্প হোক বা বেশী হোক নামায নষ্ট হবে এবং পুনরায় পড়তে হবে। কথা বলার পাঁচটি অবস্থা হতে পারেঃ-

প্রথম অবস্থা ঃ এই যে, কোন লোকের সাথে স্বয়ং কথা বলা অথবা কারো কথার জবাব দেয়া। নিজের ভাষায় হোক, অন্য কোন ভাষায় অথবা স্বয়ং কোরআনের ভাষায় হোক সকল অবস্থায় নামায নষ্ট হবে। যেমন ধরুন, ইয়াহইয়া নামক কোন ব্যক্তিকে কেউ কোরআনের ভাষায় বললো يَايَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ অথবা মরিয়ম নামের কোন মেয়েকে বললো - يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ

مَعَ الرّٰكِعِيْنَ অথবা পথিককে জিজ্ঞাসা করলো فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ অথবা কাউকে হুকুম করলো اِقْرَاْ كِتَابَكَ। অথবা কোন দুঃসংবাদ শুনে বললো اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ অথবা কারো হাচি শুনে বললো يَرْحَمُكَ اللّٰهُ অথবা কোন আজব কথা শুনে বললো سُبْحٰنَ اللّٰهِ অথবা কোন খুশীর খবর শুনে বললো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। অথবা কারো উপর নযর পড়লো এবং দেখলো যে সে আজে বাজে ও বেহুদা কথা বলছে। তখন বললো اَللّٰهُ يَهْدِيْكَ অথবা কাউকে সালাম করলো কিংবা সালামের জবাব দিল, অথবা নামাযের বাইরে কেউ দোয়া করলো এবং নামাযী আমীন বললো, অথবা 'ইয়া আল্লাহ' শুনে جَلَّ جَلَالُهُ বললো, অথবা নবী (সঃ) -এর নাম শুনে দরূদ পড়লো, অথবা কোন বাচ্চাকে পড়ে যেতে দেখে কিছু বললো- মোট কথা কোন প্রকারেই যদি কোন লোকের সাথে কেউ কথা বলে কিংবা কোন কিছুর জবাবে কিছু বলে তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ কোন পশুর দিকে দৃষ্টি দিয়ে কিছু বলা। যেমন নামায পড়ার সময় নযর পড়লো যে মুরগী অথবা বিড়াল খাবার জিনিসের উপর মুখ দিচ্ছে এবং তাকে তাড়াবার জন্যে কিছু কথা বলা, এ অবস্থায় নামায নষ্ট হবে।

তৃতীয় অবস্থা ঃ স্বয়ং নিজের থেকে কিছু কথা বলা তা নিজ ভাষায় হোক বা আরবী ভাষায় তাতে নামায নষ্ট হবে। হ্যাঁ যদি কোন এমন কথা হয় যা কুরআনে আছে তাহলে নামায নষ্ট হবে না। যদি সে কথা তার মুদ্রাদোষ হয় তাহলে তা কুরআনের শব্দ হলেও নামায নষ্ট হবে। যেমন হ্যাঁ (نعم) কারো মুদ্রাদোষ হয় যদিও তা কোরআনে আছে, তথাপি নামায নষ্ট হবে।

চতুর্থ অবস্থা ঃ দোয়া ও যিকির করা। দোয়া নিজের ভাষায় হোক অথবা আরবী ভাষায়, নামায নষ্ট হবে। আর যদি কুরআন ও হাদীসের দোয়া ও এবং যিকিরের মধ্যে থেকে কোনটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে নামায নষ্ট হবে না। তার অর্থ এই যে হঠাৎ ঘটনাক্রমে যদি এমন ভুল হয়ে যায় তাহলে নামায নষ্ট হবে না। কিন্তু ইচ্ছা করে যদি এমন করা হয় এবং অভ্যাস হয়ে পড়ে যে রুকু, সিজদা বা বৈঠকে যা খুশী তাই কিছুতেই বলা যাবে না। তারপর যা মানুষের কাছে চাওয়া যায় তা যদি নামাযের মধ্যে চাওয়া হয়, তা আরবী ভাষায় হোক না কেন, তাতে নামায নষ্ট হবে।

পঞ্চম অবস্থা ঃ কেউ নামায পড়া অবস্থায় দেখলো যে আর একজন কুরআন ভুল পড়ছে, তাহলে লোকমা দিল, তা সে নামাযের মধ্যে পড়ুক অথবা নামাযের বাইরে পড়ুক, নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ভুল পাঠকারী যদি তার ইমাম হয় তাহলে নামায নষ্ট হবে না। আর যদি মুক্তাদী কুরআন দেখে লোকমা দেয় অথবা অন্য কারো নিকটে সহীহ্ কুরআন শুনে আপন ইমামকে লোকমা দেয় তাহলে তার নামায নষ্ট হবে। আর ইমাম যদি তার লোকমা গ্রহণ করে তাহলে ইমামেরও নামায নষ্ট হবে।

২. নামাযে কুরআন দেখে পড়লেও নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৩. নামাযের শর্তগুলোর মধ্যে কোন একটি যদি খতম হয়ে যায়, তা নামায সহীহ্ হওয়ার শর্ত হোক অথবা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত উভয় অবস্থায় নামায নষ্ট হবে। যেমন, তাহারাত রইলো না, অযু নষ্ট হলো অথবা গোসলের দরকার হলো কাপড় নাপাক হলো, জায়নামায নাপাক হলো, অথবা বিনা কারণে কিবলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, অথবা সতর খুলে গেল এবং এতটা সময় পর্যন্ত খোলা রইলো যে সময়ে রুকু বা সিজদা করা যায়, অথবা অন্য কোন কারণে জ্ঞান হারিয়ে গেল অথবা পাগল হয়ে গেল, মোট কথা কোন একটি শর্ত খতম হলে নামায নষ্ট হবে।

৪. নামাযের ফরয সমূহের মধ্যে কোন একটি যদি ছুটে যায়, ভুলবশতঃ ছুটে যাক অথবা ইচ্ছা করে কোনটা ছেড়ে দেয়া হলে নামায নষ্ট হবে। যেমন, কিয়াম কেউ করলো না। অথবা রুকু সিজদা ছেড়ে দিল, অথবা কিরাআত মোটেই পড়লো না, ভুলবশতঃ এমন হোক বা ইচ্ছা করে, নামায নষ্ট হবে।

৫. নামাযের ওয়াজিবগুলোর মধ্যে কোনটা অথবা সবগুলো ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে।

৬. নামাযের ওয়াজিব ভুলে ছুটে গেলে এবং সিজদা সহু না দিলে নামায পাল্টাতে হবে।

৭. বিনা ওজরে এবং ন্যায়সংগত প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাশি দেয়া। তবে যদি রোগের কারণে আপনা আপনি কাশি আসে অথবা গলা সাফ করার জন্যে কাশি দেয় অথবা ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়ার জন্যে কাশি দেয়া হয় যাতে ইমাম বুঝতে পারে অথবা কেউ যদি এ জন্যে কাশি দেয় যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে সে নামায পড়ছে, তাহলে এসব অবস্থায় নামায নষ্ট হবে না। এসব কারণ ব্যতীত নামায নষ্ট হবে।

৮. কোন দুঃখ-কষ্ট, শোক বা কঠিন বিপদে পড়ে আঃ উঃ করলে অথবা কোন বেদনাদায়ক আওয়াজ বা আর্তনাদ করলে নামায নষ্ট হবে। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কখনো কোন শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অথবা আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে কেউ কেঁদে ফেলে অথবা তিলাওয়াতে অভিভুত হয়ে কাঁদে অথবা আঃ উঃ শব্দ বের হয়, তাহলে এসব অবস্থায় নামায নষ্ট হবে না।

৯. নামায অবস্থায় ইচ্ছা করে হোক কিংবা ভুলে যদি কেউ কিছু খেয়ে ফেলে অথবা পান করে, যেমন পকেটে কিছু খাবার জিনিস ছিল, বেখেয়ালে অথবা ইচ্ছা করে খেয়ে ফেললো তাহলে নামায নষ্ট হবে।

হ্যা তবে যদি দাঁতের মধ্য থেকে ছোলার পরিমাণ থেকে ছোট কোন কিছু বের হলো এবং নামাযী তা খেয়ে ফেললো, তাহলে নামায নষ্ট হবে না। তবে ইচ্ছা করে এমন করাও ঠিক নয়। নামাযী ভালো করে মুখ সাফ করে নামাযে দাঁড়াবে।

১০. বিনা ওজরে নামাযে কয়েক কদম চলাফেরা করা। এতেও নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১১. আমলে কাসীর করা। অর্থাৎ এমন কাজ করা যা দেখলে লোক মনে করবে যে সে ব্যক্তি নামায পড়ছে না। যেমন কেউ দু'হাতে কাপড় ঠিক করছে অথবা কোন মেয়েলোক নামাযের মধ্যে চুলের ঝুটি বাঁধছে, অথবা নামায অবস্থায় বাচ্চা দুধ খাচ্ছে তাহলে এসব অবস্থায় নামায নষ্ট হবে।

১২. কুরআন পাক তিলাওয়াতে বড় রকমের ভুল করা যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, অথবা তাকবীরের মধ্যে আল্লাহর আলিফকে খুব টেনে পড়লো, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১৩. বালেগ মানুষের অট্টহাসি করা।

১৪. দেয়ালে কোন চিত্র অথবা পোস্টার ছিল[১] অথবা পত্রের উপর নযর পড়লো এবং তা পড়ে ফেললো তাহলে নামায নষ্ট হবে। কিন্তু না পড়ে অর্থ বুঝে ফেললে নামায নষ্ট হবে না।

১৫. পুরুষের নিকটে মেয়ে লোকের দাঁড়িয়ে থাকা এমন সময় পর্যন্ত যতোক্ষণে এক সিজদা অথবা রুকু করা যায় এমন অবস্থায় নামায নষ্ট হবে। তবে যদি কোন অল্প বয়স্ক বালিকা দাঁড়ায় তাহলে নামায নষ্ট হবে না।

---

১. মসজিদের এমন স্থানে কিছু লেখা অথবা পোস্টার লাগানো ঠিক নয় যার দিকে নামাযীর নযর পড়ে।

যেসব অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয অথবা ওয়াজিব

১. নামায পড়তে পড়তে ট্রেন ছেড়ে দিল। ট্রেনে মালপত্র আছে, বাচ্চা কাচ্চা আছে। এমন অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয।

২. নামায পড়ার সময়ে সাপ এলো অথবা বিচ্ছু, বোলতা অথবা অন্য কোন অনিষ্টকর পোকামাকড় কাপড়ের মধ্যে ঢুকলো। এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দিয়ে সে অনিষ্টকর প্রাণী মারা দুরস্ত হবে।

৩. মুরগী, কবুতর অথবা কোন গৃহপালিত পাখী ধরার জন্যে বিড়াল এলো এবং যদি আশংকা হয় যে নামায ছেড়ে দিয়ে বিড়াল না তাড়ালে পাখীটা খেয়ে ফেলবে, তাহলে এ আশংকায় নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে।

৪. যদি নামায শেষ করতে গেলে আর্থিক ক্ষতির আশংকা হয় তাহলে নামায ছেড়ে দেয়া দুরস্ত হবে। যেমন কোন মেয়েলোক নামায পড়ছে। চুলার উপর পাতিল চড়ানো আছে। পাতিলের জিনিস পুড়ে যেতে পারে অথবা উথলে পড়ে যেতে পারে, অথবা মসজিদে কেউ নামায পড়ছে এবং জুতা-ছাতা প্রভৃতি এমন স্থানে রাখা আছে যে চুরি হওয়ার ভয় হচ্ছে, অথবা কোন মেয়ে লোক ঘরেই নামায পড়ছে এবং ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে যার কারণে চুরি হওয়ার আশংকা আছে, অথবা বাড়ির মধ্যে কুকুর, বিড়াল অথবা বাঁনর ঢুকেছে এবং আশংকা হচ্ছে যে তারা কিছু ক্ষতি করবে, মোট কথা যেসব অবস্থায় আর্থিক ক্ষতি হওয়ার আশংকা হয় সেসব অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া জায়েয। আর যদি অতি সামান্য ক্ষতির আশংকা হয় তাহলে নামায পুরা করা ভালো।

৫. নামাযে পেশাব পায়খানার বেগ হলে নামায ছেড়ে দিয়ে পেশাব পায়খানা সেরে পুনরায় অযু করে নামায পড়া উচিত।

৬. কোন অন্ধ ব্যাক্তি পথ চলছে। সামনে কুয়া আছে অথবা নদীর তীর, পড়ে গেলে ডুবে মরতে হবে। তাকে বাঁচাবার জন্যে নামায ছেড়ে দেয়া ফরয হবে। আল্লাহ্ না করুন যদি সে মরে যায় তাহলে নামাযী গোনাহ্গার হবে।

৭. নামায পড়ার সময় কোন বাচ্চার গায়ে আগুন লাগলো অথবা কোন অবুঝ শিশু ছাদের কিনারায় পৌঁছালো, অথবা ঘরে বাঁনর ঢুকলো এবং আশংকা হয় যে সে

দুধের শিশুকে ধরে নিয়ে যাবে, অথবা কোন ছোট শিশু হাতে ছুরি বা ব্লেড তুলে নিয়েছে এবং আশংকা হয় যে নিজের বা অপর কোন শিশুর হাত পা কেটে দেয় অথবা রেলগাড়ী বা মোটর-গাড়ীতে কারো চাপা পড়ার আশংকা হয়, অথবা চোর ডাকাত বা দুশমন কাউকে আহত করেছে এ সকল অবস্থায় বিপদগ্রস্তকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচানোর জন্যে নামায ছেড়ে দেয়া ফরয হবে তবে, না ছাড়লে শক্ত গোনাহগার হতে হবে।

৮. মা, বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী, যদি কোন বিপদে পড়ে ডাক দেয় তাহলে তাদের সাহায্যের জন্য নামায ছেড়ে দেয়া ফরয হবে। যদি তাদের সাহায্যের জন্য নিকটে আর কেউ থাকে অথবা বিনা প্রয়োজনে তারা ডাকছে তাহলে নামায ছেড়ে না দেয়া ভালো। যদি নফল অথবা সুন্নত নামায পড়াকালে তারা বিনা প্রয়োজনে ডাকে এবং তাদের জানা নেই যে যাকে ডাকছে সে নামায পড়ছে, তথাপি নামায ছেড়ে তাদের কথার জবাব দেয়া ওয়াজিব।

নামায পড়ার বিস্তারিত নিয়ম পদ্ধতি

যখন কেউ নামায পড়ার ইরাদা করবে তখন তাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে হবে যে, নামাযের শর্তগুলোর মধ্যে কোনটি বাদ যায় নি। তারপর একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে ধারণা করতে হবে যে সে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর একনিষ্ঠ হয়ে পূর্ণ অনুভূতির সাথে নিম্নের দোয়া পড়ে নেবে।

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

আমি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আমার মুখ সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি আসমান ও যমীন পয়দা করেছেন এবং আমি তাদের মধ্যে নই যারা তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। বস্তুতঃ আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লহরই জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক প্রভু। তাঁর কোন শরীক নেই আমার উপর এরই হুকুম হয়েছে এবং অনুগতদের মধ্যে আমিই সকলের প্রথম অনুগত।

অতঃপর নামাযী সোজা দাঁড়িয়ে নামাযের নিয়ত করবে। অর্থাৎ মনে এ ইরাদা করবে যে, সে অমুক ওয়াক্তের এতো রাকায়াত নামায পড়ছে।

নিয়ত আসলে মনের ইরাদার নাম। আর এটারই প্রয়োজন। (তবে এ ইরাদাকে শব্দের দ্বারা মুখে উচ্চারণ করা ভালো) যেমন "আমি মাগরিবের তিন রাকায়াত ফরয নামায পড়ছি"। আর যদি ইমামের পেছনে নামায পড়া হয় তাহলে এ নিয়ত ও করতে হবে যে, "এ ইমামের পেছনে নামায পড়ছি।"।

তাকবীর

দেহকে স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ান। দু'পায়ের মাঝখানে অন্ততঃ চার আঙ্গুল ফাক যেন অবশ্যই থাকে। দৃষ্টি সিজদার স্থানে উপর রাখুন এবং নিয়তের সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কানের গোড়া পর্যন্ত উঠান, যেন হাতুলি কেবলার দিকে থাকে এবং আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা থাকে। তারপর দু'হাত নাভীর নীচে এমনভাবে বাধুন যেন ডান হাতের হাতুলি বাম হাতের পিঠের উপর থাকে। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও ছোট আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরুন। ডান হাতের বাকী আঙ্গুলগুলো বাম হাতের উপর ছড়িয়ে রাখুন।[১]

তারপর নিম্নের দোয়া বা সানা পড়ুন ঃ-

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ -

তুমি পাক ও পবিত্র, হে আল্লাহ! তুমিই প্রশংসার উপযুক্ত। তুমি বরকতদানকারী এবং মহান। তোমার নাম ও মর্যাদা বহু উচ্চে। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।[২]

---

১. আহলে হাদীসের নিয়ম এই যে, নারী-পুরুষ উভয়েই বুকের উপর হাত বাঁধবে। তাঁরা আরও বলেন, নারী-পুরুষ উভয়ই কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে।

২. আহলে হাদীসগণ নিম্নের এই দোয়া পড়েন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَا يَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرِبِ - اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْعَضُ مِنَ

সানার পর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও সূরা পড়ুন।

সূরা ফাতেহা ও কুরআন পাঠ

তারপর সূরায়ে ফাতেহা পড়ে আমিন বলুন। আর যদি আপনি মুক্তাদি হন তাহলে সানা পড়ার পর চুপ চাপ ইমামের কিরাআত শুনুন।[১] ইমাম সূরায়ে ফাতেহা শেষ করলে আস্তে আমীন বলুন।[২] তারপর কোরআনের কোন সূরা বা কয়েকটি আয়াত পড়ুন, অন্ততঃ ছোট ছোট তিনটি আয়াত। আপনি মুক্তাদি হলে চুপ থাকতে হবে।

রুকু'

কিরায়াত পড়ার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে যান।[৩] রুকুতে হাত হাঁটুর উপর রেখে আঙ্গুল দিয়ে হাঁটু ধরুন। দু'হাত সটান সোজা রাখুন। রুকু'র সময়ে খেয়াল রাখতে হবে যে মাথা যেন কোমর থেকে বেশী নীচে নেমে না যায় অথবা উচু না হয়। বরঞ্চ কোমর এবং মাথা একেবারে বরাবর থাকবে। তারপর তিনবার নিম্ন তসবিহ পড়বেন।

রুকুর তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ সমস্ত দোষত্রুটি থেকে পাক আমার মহান প্রভু।[৪] এ তাসবিহ (سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ) তিন বারের বেশী পাঁচ, সাত, নয় অথবা আরও বেশীবার বলতে পারেন। যদি আপনি ইমাম হন তাহলে মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল রাখবেন। এতো বেশী পড়বেন না যাতে তাঁরা পেরেশানি বোধ করেন। তবে যতোবারই পড়ুন বেজোড় পড়বেন।

الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ مِنَ الْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ـ

১. আহলে হাদীসগণ ইমামের পেছনে আস্তে আস্তে সূরা ফাতেহা পড়েন।

২. যেসব নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়া হয় তাতে আহলে হাদীসগণ ইমামের পিছনে উচ্চস্বরে আমীন বলেন।

৩. আহলে হাদীসগণ রুকু'তে যাবার সময়, রুকু' থেকে উঠার সময়, দু'রাকায়াত পড়ে তৃতীয় রাকায়াতের জন্যে উঠার সময় 'রফে ইয়া-দাইন' করেন অর্থাৎ কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠান।

৪. আহলে হাদীসগণ পড়েন سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ।-পাক ও মহান তুমি আয় আল্লাহ। আমাদের প্রভু প্রশংসার অধিকারী। হে আমার প্রভু আমাকে মাফ করে দাও।

কাওমা

রুকুর পরে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (আল্লাহ তার কথা শুনেছেন যে তাঁর তারিফ করেছে) বলে বিলকুল সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং বলুন رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ (হে আমাদের রব, সমস্ত প্রশংসা তোমারই)। যদি আপনি মুক্তাদী হন তাহলে দ্বিতীয়টি পড়বেন। আর ইমাম হলে প্রথমটি পড়বেন।[১]

সিজদা

তারপর তাকবীর বলে সিজদায় যান। সিজদা এভাবে করুন, প্রথমে দু'হাঁটু যমীনের উপর রাখুন, তারপর দু'হাত, তারপর নাক এবং তারপর কপাল। চেহারা দু'হাঁতের মাঝখানে থাকবে। বুড়ো আঙ্গুল কানের বরাবর থাকবে। হাতের আঙ্গুল মেলানো থাকবে এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ কিবলামুখী থাকবে। দু'কনুই যমীন থেকে উপরে থাকবে এবং হাঁটু ও রান থেকে আলাদা থাকবে এবং পেট ও রান থেকে আলাদা থাকবে। কনুই যমীন থেকে এতটা উচুতে থাকবে যেন একটা ছোট ছাগল ছানা ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। দু পা আঙ্গুলের উপর ভর করে মাটিতে লেগে থাকবে এবং আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী থাকবে।

সিজদায় অন্ততঃপক্ষে তিনবার থেমে থেমে سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى পড়ুন।

জলসা

তারপর তাকবীর বলে প্রথমে কপাল তারপর হাত উঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসুন। বসার পদ্ধতি এই যে, ডান পা খাড়া থাকবে এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর দু'জানু হয়ে বসুন। তারপর দু'হাত দু'জানুর উপর এমনভাবে রাখুন যেন আঙ্গুলগুলো হাটুর উপর থাকে।[২] তারপর তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদায় যান। প্রথম সিজদার মতো এ সেজদা করুন। দু' সেজদা করার পর তাকবীর বলে দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্যে

---

১. এ অবস্থায় আহলে হাদীসগণ বলেন–

رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ

২. জলসায় পড়ার জন্যে দোয়া হাদীসে বর্ণিত আছে। আহলে হাদীসগণ এ দোয়া পড়ার তাকীদ করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ

হে আল্লাহ! আমায় মাফ কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে সচ্ছলতা দান কর এবং আমাকে রুজি দান কর। (আবু দাউদ)

দাড়ান।[১] তারপর বিসমিল্লাহ্ সূরা ফাতেহা এবং কিরাআত পড়ে দ্বিতীয় রাকায়াত পুরা করুন।

কা'দা (قَعْدَةٌ)

তারপর প্রথম রাকায়াতের মতো রুকু, কাওমা, সিজদা ও জলসা করুন এবং দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে কা'দায় বসে যান। কা'দায় বসার ঐ একই পদ্ধতি যা জলসায় বসার বয়ান করা হয়েছে। তারপর ধীরস্থিরভাবে থেমে থেমে তাশাহহুদ পড়ুন।

তাশাহহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ للّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত ইবাদত ও সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর জন্যে। হে নবী (সঃ) আপনার উপর সালাম। তাঁর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক আপনার উপর। সালাম বর্ষিত (শান্তি) হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।

"লা ই-লাহা" বলবার সময় ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল এবং মধ্যম আঙ্গুল দিয়ে চক্র বানিয়ে অন্যান্য আঙ্গুলগুলো বন্ধ করে শাহাদাত আঙ্গুল আসমানের দিকে তুলে ইশারা করুন এবং ইল্লাল্লাহ্ বলবার সময় আঙ্গুল নামিয়ে নিন। সালাম ফেরা পর্যন্ত আঙ্গুলগুলো ঐভাবে রাখুন।

যদি চার রাকায়াতওয়ালা নামায হয় তাহলে তাশাহহুদ পড়ার পর তাকবীর বলে তৃতীয় রাকায়াতের জন্যে দাঁড়ান। তারপর ঐভাবে বিসমিল্লাহ্ ও সূরা ফাতেহা পড়ুন। যদি সুন্নত বা নফল নামায হয় তাহলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকায়াতে সূরা ফাতেহার পর কোন সূরা বা কয়েকটি আয়াত পড়ুন। যদি ফরয নামায হয় তাহলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকায়াতে সূরা ফাতেহার পর কুরআনের কোন অংশ পড়বেন না। শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে রুকুতে চলে যান। চতুর্থ রাকায়াতের উভয় সিজদা করার পর "আত্তাহিয়্যাতু" পড়ুন। তারপর নিম্ন দরূদ শরীফ পড়ুন।

---

১. আহলে হাদীসের মতে, প্রথম এবং দ্বিতীয় সিজদা করার পর একটু বসে তারপর দাঁড়ানো উচিত। সিজদা থেকে সরাসরি উঠা ঠিক নয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

হে আল্লাহ! সালাম ও রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর যেমন তুমি রহমত নাযিল করেছ ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর। হে আল্লাহ! বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছ ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর।

দরূদের পর দোয়া

দরূদের পর নিম্নের দোয়া পড়ুন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

হে আল্লাহ! আমি আমার উপরে বড় যুলুম করেছি এবং তুমি ছাড়া এমন কেউ নেই যে গোনাহ মাফ করতে পারে। অতএব তুমি আমাকে তোমার খাস মাগফেরাত দান কর এবং আমার উপর রহম কর। অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াশীল। অথবা নিম্নের দোয়া পড়ুন কিংবা উভয়টি পড়ুন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ (আশ্রয়) চাই জাহান্নামের আযাব থেকে এবং কবরের আযাব থেকে, পানাহ চাই মাসীহে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে, পানাহ চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে। হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই গোনাহ থেকে এবং প্রাণান্তকর ঋণ থেকে।

সালাম

এ দোয়া পড়ার পর নামায শেষ করার জন্য প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলুন 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ' তারপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলুন 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ' একথাগুলো বলার সময়ও মনে করতে হবে যে আপনার এ সালামত ও রহ্মতের দোয়া নামাযে অংশগ্রহণকারী সকল নামাযীদের এবং ফেরেশতাদের জন্যে। নামায শেষ করে যে কোন জায়েয দোয়া করতে পারেন। নবী (সঃ) থেকে বহু দোয়া ও যিকির বর্ণিত আছে। এসব দোয়া ও যিকিরের অবশ্যই অভ্যাস করবেন। কিছু দোয়া নিম্নে দেয়া হলো –

নামাযের পরে দোয়া

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ -

আমি আল্লাহর কাছে মাফ চাই। হে আল্লাহ! তুমিই শান্তির প্রতীক, শান্তিধারা তোমার থেকেই প্রবাহিত হয়। তুমি নেহায়েত মংগল ও বরকত ওয়ালা, হে দয়া ও অনুগ্রহের মালিক। (মুসলিম)

২. একদিন নবী (সঃ) হযরত মায়ায (রাঃ) এর হাত ধরে বলেন, মায়ায! আমি তোমাকে ভালবাসি। তারপর বলেন, আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, তুমি কোন নামাযের পর এ দোয়টি করতে ভুলো না। প্রত্যেক নামাযের পর অবশ্যই পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (رياض الصلين)

আয় আল্লাহ! তুমি আমায় মদদ কর যেন আমি তোমার যিকর ও তোমার শোকর আদায় করতে পারি এবং ভালোভাবে তোমার বন্দেগী করতে পারি।

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِىَ لِمَ مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (بخارى - مسلم)

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন শরীক নেই।

কর্তৃত্ব প্রভুত্ব বাদশাহী একমাত্র তাঁরই এবং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের একমাত্র অধিকারী তিনি। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তমি যা দান কর তা কেউ ঠেকাতে পারে না। যা তুমি দাও না, তা আর কেউ দিতে পারে না। কোন মহান ব্যক্তির মহত্ব তোমার মুকাবিলায় কোনই কাজে আসে না। (রিয়াদুস সালেহীন)

৪. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবর ৩৩ বার এবং একবার

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

আল্লাহ পাক ও পবিত্র, সব প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ সকলের বড়, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই। তিনি এক এবং তার কোন শরীক নেই। বাদশাহী তাঁর এবং প্রশংসা বলতে একমাত্র তাঁরই। এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সহীহ মুসলিম, আবু হুরায়রাহ হতে বর্ণিত)

নারীদের নামাযের পদ্ধতি

নামাযের অধিকাংশ আরকান আদায় করার পদ্ধতি নারীদের জন্যেও তাই যা পুরুষের জন্যে। তবে নারীদের নামাযে ছ'টি জিনিস আদায় করার ব্যাপারে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যের বুনিয়াদী কারণ হলো এ-ধারণায় যে নামাযের মধ্যে নারীদেরকে সতর এবং পর্দার বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। যে ছ'টি জিনিস সমাধা করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তা হলো–

১. তাকবীর তাহরীমায় হাত উঠানো

শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক সর্বদা নারীদের চাদর অথবা দুপাট্টা প্রভৃতির ভেতর থেকে তাকবীর তাহরীমার জন্যে হাত উঠাতে হবে। চাদর বা দুপাট্টার বাইরে হাত বের করা উচিত নয় এবং হাত শুধু কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। কান পর্যন্ত উঠাবে না।

২. হাতবাধা

মেয়েলোকের হামেশা বুকের উপর হাত বাধতে হবে। বুকের নীচে নাভীর উপর বাধা উচিত হবে না। ডান হাতের বুড়া এবং ছোট আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরার পরিবর্তে শুধু ডান হাতের হাতুলি বাম হাতুলির পিঠের উপর রাখবে।

৩. রুকু'

মেয়েদেরকে রুকু'তে শুধু এতটুকু ঝুঁকে পড়তে হবে যেন দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। হাঁটু আঙ্গুল দিয়ে ধরার পরিবর্তে শুধু মেলানো আঙ্গুলগুলো হাঁটুর উপর রাখবে। উপরন্তু দু'হাঁতের কনুই-দুপার্শ্বের সাথে মিলিত থাকতে হবে।

৪. সিজদাহ

সিজদার মধ্যে মেয়েদের পেট উরুর সাথে এবং বাহু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখতে হবে। কনুই পর্যন্ত হাত মাটিতে রাখতে হবে এবং দু'পা খাড়া না রেখে বিছিয়ে রাখতে হবে।

৫. কা'দা এবং জলসা

কা'দা অথবা জালসায় দু'পা ডান দিকে করে বাম পার্শ্বের উপর এমনভাবে বসবে যেন ডান দিকের রান বাম দিকের রানের সাথে এবং ডান পায়ের মাংসপিণ্ড বাম পায়ের উপর আসে।

৬. কিরাআত

মেয়েদেরকে সর্বদা নিঃশব্দে কিরাআত পড়তে হবে। কোন নামাযেই উচ্চ শব্দ করে কিরাআত পড়ার অনুমতি তাদের নেই।

বিতর নামাযের বিবরণ

বিতর নামায পড়ার নিয়ম

এশার নামাযের পর যে নামায পড়া হয় তাকে বিতর বলে। তাকে বিতর বলার কারণ এই যে, তার রাকায়াতগুলো বেজোড়। বিতর নামায ওয়াজিব। নবী (সঃ) এ নামাযের জন্যে বিশেষ তাকিদ করেছেন। তিনি বলেন–

যে ব্যক্তি বিতর পড়বে না। আমাদের জামায়াতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। বিতরের নামায মাগরিবের মতো তিন রাকায়াত।[১]

বিতর নামায পড়ার নিয়ম এই যে, ফরয নামাযের মতো দু'রাকায়াত নামায পড়ুন। তারপর তৃতীয় রাকায়াতে সূরা ফাতেহার পর কোন ছোটো সূরা অথবা কয়েক আয়াত পড়ুন। তারপর তাকবির বলে দু'হাত কান পর্যন্ত এমনভাবে উঠান যেমন তাকবীর তাহরিমায় উঠান। তারপর হাত বেধে আস্তে আস্তে দোয়া কুনুত পড়ুন।[২]

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ

---

১. ইমাম শাফেয়ী এবং আহলে হাদীস এক রাকায়াত পড়ার পক্ষে। আহলে হাদীসের নিকটে তিন, পাঁচ, সাত এবং নয় রাকায়াত পর্যন্ত পড়াও জায়েয। এ জন্যে যে, হাদীস থেকে তা প্রমাণিত আছে। পড়ার নিয়ম এই যে, যদি কেউ তিন বা পাঁচ রাকায়াত এক সালামে পড়তে চায় তাহলে মাঝখানে তাশাহুদের জন্যে না বসে শেষ রাকায়াতে বসে তাশাহুদ দরূদ পড়ে সালাম ফেরাবে। সাত অথবা নয় রাকায়াত এক সালামে পড়তে হলে শেষ রাকায়াতের আগে বসবে এবং শুধু 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ে দাঁড়াবে। তারপর এক রাকায়াত পড়ে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দোয়া পড়ে সালাম ফেরাবে। [নামাযে মুহাম্মদী মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগরী (রঃ)]

২. আহলে হাদীসের মতে রুকুর পর হাত বাঁধার পরিবর্তে আসমানের দিকে দু'হাত তুলে দোয়া কুনুত পরতে হবে।

يَّفْجُرُكَ - اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ -

হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্যপ্রার্থী এবং তোমার কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার উপর আমরা ঈমান রাখি এবং তোমারই উপর ভরসা করি, তোমার উত্তম প্রশংসা করি, তোমার শোকর আদায় করি, তোমার না শোকরি করি না (কৃতঘ্নতা করি না)। যারা তোমার নাফরমানি করে তাদেরকে পরিত্যাগ করছি ও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি। আয় আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি তোমারই জন্যে নামায পড়ি এবং তোমাকেই সিজদা করি, তোমার দিকেই দ্রুত ধাবিত হই, তোমারই হুকুম মানার জন্যে প্রস্তুত থাকি, তোমার রহমতের আশা রাখি, তোমার আযাবকে ভয় পাই। তোমার আযাব অবশ্যই কাফেরদেরকে পেয়ে বসবে।

যদি তার সাথে নিম্নের দোয়া পড়া হয় তো ভালো হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِى فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ - اِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَّلَيْتَ وَلَايَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ -

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হেদায়েত দান করে হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল কর। তুমি আমাকে সচ্ছলতা দান করে সচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল কর, তুমি আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাদের মধ্যে শামিল কর যাদের তুমি অভিভাবক হয়েছ। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার মধ্যে বরকত দাও, তুমি আমাকে ঐ অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর যার তুমি ফায়সালা করেছ। কারণ তুমিই ফায়সালাকারী

এবং তোমার উপর অন্য কারো ফায়সালা কার্যকর হয় না। তুমি যার অভিভাবকত্ব কর তাকে কেহ হীন লাঞ্ছিত করতে পারে না। এবং সে কখনো সম্মান পেতে পারে না যাকে তুমি তোমার দুশমন বানিয়েছ। তুমি খুবই বরকতওয়ালা, হে আমার রব, সুউচ্চ ও সুমহান, দরূদ ও সালাম হোক পিয়ারা নবীর (সা:) উপর, তাঁর বংশধরের উপর। (আহলে হাদীসের লোক বিতরে এ দোয়া পড়েন।)

দোয়াকুনুত যদি মুখস্থ না থাকে, তাহলে যত শীঘ্র সম্ভব মুখস্ত করতে হবে। যতদিন মুখস্থ না হবে ততদিন দোয়া কুনুতের স্থলে নিম্নের দোয়া পড়তে হবে–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মংগল দাও এবং আখিরাতে মংগল দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

যদি এটাও মনে না থাকে তাহলে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ তিনবার পড়বেন।

জামায়াতে নামাযের বর্ণনা

জামায়াতে নামাযের তাকীদ ও ফযিলত

কুরআন ও সুন্নায় জামায়াতের সাথে নামাযের অত্যাধিক তাকীদ এবং ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, ফরয নামায তো জামায়াতে পড়ারই বিষয় এবং ইসলামী সমাজে জামায়াত ব্যতীত ফরয নামায পড়ার কোন ধারণাই করা যেতে পারে না। অবশ্য যদি প্রকৃত ওযর থাকে তো ভিন্ন কথা। কুরআনের নির্দেশ

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ - (البقره : ٤٣)

–এবং রুকু'কারীদের সাথে রুকু' কর – (বাকারাহ ঃ ৪৩)

মুফাস্সিরগণ সাধারণত এ আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন যে, নামায জামায়াতের সাথে আদায় করা উচিত– (মায়ালেমুত্তানযীল, খাযেন, তাফসীরে কাবীর প্রভৃতি)।

দীনের মধ্যে জামায়াতসহ নামাযের অসাধারণ গুরুত্ব ও তাকীদের অনুমান এর থেকে করুন যে, লড়াইয়ের ময়দানে যখন প্রতি মুহূর্তে দুশমনের সাথে রক্তাক্ত সংঘর্ষের আশংকা হয়, তখনও এ তাকীদ করা হয়েছে যে, আলাদা, আলাদা নামায না পড়ে বরঞ্চ জামায়াতের সাথেই পড়তে হবে। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১০২ নং আয়াতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশ এসেছে।

জামায়াতে নামাযের তাকীদ ও ফযিলত সম্পর্কে নবী পাক (সঃ) অনেক কিছু বলেছেন। তার গুরুত্ব ও বরকত উল্লেখ করে তিনি প্রেরণা দিয়েছেন এবং জামায়াত পরিত্যাগকারীদের জন্য কঠিন সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন–

" মুনাফিকদের নিকটে ফজর এবং এশার নামায থেকে বেশী কঠিন কোন নামায নেই। তাঁরা যদি জানতো যে এ দু'নামাযের কতখানি সওয়াব তাহলে তারা সব সময়ে এ দু'নামাযের জন্যে হাযির হতো, (এমন কি) হাঁটুর উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে আসতো।"

তারপর তিনি বলেন-

"আমার মন বলছে যে, কোন মুয়াযযিনকে হুকুম দেই যে, জামায়াতের ইকামত দিক এবং আমি কাউকে হুকুম দেই যে, সে আমার স্থানে ইমামতী করুক এবং আমি স্বয়ং আগুনের কুন্ডলি নিয়ে তাদের ঘরে লাগিয়ে দেই এবং তাদেরকে জ্বালিয়ে মারি যারা আযান শুনার পরও ঘর থেকে বের হয় না"- (বুখারী, মুসলিম)

"নামায জামায়াত সহ পড়া একাকী পড়া থেকে সাতাশ গুণ বেশী ফযিলত রাখে।" - (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন-

"যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক নামায নিয়মিতভাবে জামায়াতের সাথে আদায় করবে এমনভাবে যে, তাকবীরে উলাও তার ছুটে যাবে না, তাহলে তার জন্যে দু'টি জিনিস থেকে অব্যাহতির ফায়সালা করা হয়। (অর্থাৎ দুটি জিনিস থেকে তার হেফাজত এবং নাজাতের ফায়সালা আল্লাহ্ তায়ালা করেন)। একটি জাহান্নামের আগুন থেকে অব্যাহতি এবং দ্বিতীয়টি মুনাফেকী থেকে অব্যাহতি ও হেফাযত"- (তিরমিযী)।

হযরত উবাই বিন কা'ব (রা)-এর বর্ণনা, নবী (সঃ) বলেন-

"যদি লোকেরা জামায়াতে নামাযের সওয়াব ও প্রতিদান জানতে পারতো তাহলে তারা যে অবস্থায়ই থাক না কেন দৌড়ে এসে জামায়াতে শামিল হতো। জামায়াতের প্রথম কাতার এমন, যেন ফেরেশতাদের কাতার। একা নামায পড়ার চেয়ে দু'জনে নামায পড়া ভালো। তারপর মানুষ যতো বেশী হবে ততোই আল্লাহ্র নিকটে সে জামায়াত বেশী পছন্দনীয় ও প্রিয় হবে। (আবু দাউদ)

নবী (সঃ) আরও বলেন-

"যারা অন্ধকার রাতে জামায়াতে নামাযের জন্যে মসজিদে যায়, তাদেরকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দাও যে, কিয়ামতের দিন তারা পরিপূর্ণ আলো লাভ করবে" - (তিরমিযী)।

হযরত উসমান (রা) বলেন, নবী (সঃ) এরশাদ করেন-

"যে ব্যক্তি এশার নামায জামায়াতে আদায় করে সে অর্ধেক রাত ইবাদত করার সওয়াব পাবে এবং যে ফজরের নামায পড়বে সে গোটা রাতের ইবাদাতের সওয়াব পাবে"- (তিরমিযী)।

জামায়াতের হুকুম

১. পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে জামায়াত ওয়াজিব। কোন ওয়াক্ত মসজিদের বাইরে হলেও ওয়াজিব। যেমন ঘর অথবা মাঠে ময়দানে। ঘরে জামায়াত করা জায়েয বটে কিন্তু কোন ওযর ব্যতীত এমন করা ঠিক নয়। মসজিদেই জামায়াতে নামায পড়া উচিত।

২. জুমা এবং ঈদাইনের জন্য জামায়াত শর্ত। অর্থাৎ জামায়াত ব্যতীত না জুমার নামায পড়া যায়, আর না ঈদাইনের নামায।

৩. রমযানের তারাবীহ নামায জামায়াতে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, যদিও পূর্ণ কুরআন পাক জামায়াতের সাথে পড়া হয়ে থাকে।

৪. নামাযে কসুফেও জামায়াত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

৫. রমযানের বিতরের নামায জামায়াতে পড়া মুস্তাহাব।

৬. নামাযে খসুফে জামায়াত মাকরুহ তাহরীমী।

৭. সাধারণ নফল নামাযেও জামায়াত মাকরুহ যদি ফরয নামাযের মতো ডেকে নেয়ার জন্যে আযান ও ইকামতের ব্যবস্থা করা হয়। তবে কোন সময়ে কোন আয়োজন ব্যতিরেকে কিছু লোক একত্র হয়ে নফল নামায জামায়াতে আদায় করলে কোন দোষ নেই।

জামায়াত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

১. পুরুষ হওয়া। মেয়েদের জন্যে জামায়াতে নামায ওয়াজিব নয়।

২. বালেগ হওয়া। নাবালেগ বাচ্চাদের জন্যে জামায়াত করা ওয়াজিব নয়।

৩. জ্ঞান থাকা। বেহুশ, পাগল নেশাগ্রস্তদের জন্যে জামায়াত ওয়াজিব নয়।

৪. ঐসব ওযর না থাকা যার কারণে জামায়াত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে।

জামায়াত ছেড়ে দেয়ার ওযর

যেসব ওযর থাকলে জামায়াত না করা যায় তা চার প্রকার। এসব কারণে জামায়াত তো ছাড়া যায়, কিন্তু যতদূর সম্ভব জামায়াতে যোগদান করা ভালো।

১. নামাযী মসজিদ পর্যন্ত যেতে অপারগ। যেমন–

(ক) এত দুর্বল যে, চলতে পারে না।

(খ) এমন রোগ যে, চলাফেরা করা যায় না।

(গ) অন্ধ অথবা পঙ্গু অথবা পা কাটা হলে। এমন অবস্থায় তাকে কেউ মসজিদে পৌঁছিয়ে দিলেও তার জন্যে জামায়াত ওয়াজিব নয়।

২. মসজিদে যেতে খুব অসুবিধা হওয়া অথবা রোগ বৃদ্ধির আশংকা। যেমন–

(ক) মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

(খ) ভয়ানক শীত এবং বাইরে বেরুলে অসুখ হওয়ার আশংকা।

(গ) ভয়ানক অন্ধকার, রাস্তা দেখা যায় না।

(ঘ) মসজিদের রাস্তায় কাদা–পানি থাকা।

(ঙ) যানবাহন ছেড়ে যাওয়ার আশংকা এবং পরবর্তী যানবাহনের অপেক্ষা করলে ক্ষতির আশংকা।

৩. জান ও মালের ক্ষতির আশংকা হওয়া, যেমন–

(ক) মসজিদের রাস্তায় কোন অনিষ্টকর প্রাণী থাকা, সাপ অথবা হিংস্র পশু প্রভৃতি।

(খ) দুশমনের ওঁত পেতে বসে থাকা।

(গ) পথে চোর ডাকাতের ভয় অথবা বাড়ীতে চুরি হওয়ার আশংকা।

৪. এমন কোন মানবীয় প্রয়োজন যা পূরণ না করলে নামাযে মন না লাগার আশংকা। যেমন–

(ক) ক্ষুধা লাগা এবং খানা হাযির।

(খ) পেশাব পায়খানার বেগ হওয়া।

কাতার সোজা করা

১. জামায়াতের জন্যে কাতার সোজা করার পুরাপুরি ব্যবস্থা করা উচিত। নবী (সঃ)–এর নির্দেশ হচ্ছে–

"নামাযে তোমাদের কাতার সোজা ও বরাবর রাখ। এরূপ করা নামাযের অংশ।" (বুখারী, মুসলিম)।

২. প্রথমে সামনের কাতারগুলো সোজা এবং সমান করতে হবে। তারপর কিছু ত্রুটি যদি থাকে তো পেছনের কাতারগুলোতে থাকবে।

৩. ইমামের পেছনে তাঁর নিকটে ঐসব লোক থাকবেন যারা ইলম ও দূরদর্শিতায় অগ্রসর। তারপর নিকটে ঐসব লোক হবে যারা বুদ্ধি-বিবেচনার দিক দিয়ে তাদের নিকটবর্তী হবে।

৪. ইমামের পেছনে থাকবে প্রথমে পুরুষের কাতার, তারপর বালকদের এবং সব শেষে মেয়েদের।

৫. মুক্তাদী ইমামের উভয় দিকে দাঁড়াবে যেন ইমাম মাঝখানে থাকেন, এমন যেন না হয় যে, ইমামের এক দিকে বেশী লোক এবং অন্যদিকে কম।

৬. যদি একজনই মুক্তাদী হয়, বালেগ পুরুষ হোক অথবা না-বালেগ বালক, ইমামের ডান দিকে একটু পেছনে তার দাঁড়ানো উচিত। একজন মুক্তাদীর ইমামের পেছনে বা বাঁয়ে দাঁড়ানো মাকরুহ।

৭. একাধিক মুক্তাদী হলে তাদেরকে ইমামের পেছনে দাঁড়াতে হবে। যদি দু'জন মুক্তাদী হয় এবং তারা ইমামের ডানে বামে দাঁড়ায় তাহলে মাকরুহ তানযীহী হবে। দুয়ের বেশী হলে মাকরুহ তাহরীমী হবে। কেননা, দু'য়ের বেশী মুক্তাদী হলে, ইমামের জন্য সামনে দাঁড়ানো ওয়াজিব হবে- (ইলমুল ফিকাহ- দুররে মুখতার, শামী)

৮. প্রথমে যদি একজন মুক্তাদী থাকে এবং পরে আরও মুক্তাদী এসে যায়, তাহলে ইমামের বরাবর দন্ডায়মান মুক্তাদীকে পেছনের কাতারে টেনে নিতে হবে অথবা ইমাম সামনে এগিয়ে দাঁড়াবেন যাতে মুক্তাদীগণ সকলে মিলে ইমামের পেছনে একই কাতারে দাঁড়াতে পারে।

৯. আগের কাতার পুরা হয়ে গেলে পরে যে আসবে সে একা পেছনের কাতারে দাঁড়াবে না। আগের কাতার থেকে কাউকে টেনে পেছনের কাতারে আনতে হবে। তবে এ মাসয়ালা যার জানা নেই তাকে টানলে খারাপ মনে করবে।

১০. আগের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পেছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরুহ।

সুতরা

১. যদি কেউ এমন স্থানে নামায পড়ে যার সামনে দিয়ে লোক যাতায়াত করে, তাহলে তার সামনে এমন কিছু রাখা উচিৎ যা প্রায় একগজ উঁচু হবে এবং অন্তত এক আঙ্গুল পরিমাণ মোটা হবে। এটা করা মুস্তাহাব।

২. নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া গুনাহের কাজ। কিন্তু সুতরা (উপরে বর্ণিত জিনিস) খাড়া করে রাখলে সামনে দিয়ে যাতায়াত করলে গুনাহ হবে না। কিন্তু সুতরা এবং নামাযীর মাঝখানে দিয়ে যাওয়া চলবে না।

৩. ইমাম যদি তার সামনে সুতরা খাড়া করে তাহলে তা সকল মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট হবে। তখন জামায়াতের সামনে দিয়ে যাওয়া গুনাহ হবে না।

জামায়াত সম্পর্কে মাসয়ালা

১. যদি কেউ তার নিকটস্থ মসজিদে এমন সময় পৌঁছে দেখে যে, জামায়াত হয়ে

গেছে, তাহলে তার অন্য কোন মসজিদে জামায়াত ধরার জন্যে চেষ্টা করা মুস্তাহাব। ঘরে এসে ঘরের লোকদের সাথে জামায়াত করাও জায়েয।

২. জামায়াত সহীহ হওয়ার জন্য প্রয়োজন এই যে, ইমাম এবং মুক্তাদীর নামাযের স্থান যেন এক হয়, যেমন একই মসজিদে অথবা একই ঘরে উভয়ে নামায পড়ছে, অথবা ইমাম মসজিদে মুক্তাদী বাইরে সড়কে কিংবা নিজের বাড়ীতে দাঁড়ায় কিন্তু মাঝখানে ক্রমাগত কাতার দাঁড়িয়ে গেছে।

৩. যদি ইমাম মসজিদের ভেতরে এবং মুক্তাদী মসজিদের ছাদে দাঁড়ায় অথবা কারো বাড়ী মসজিদের সাথে লাগানো এবং সে তার বাড়ীর উপরে দাঁড়িয়েছে কিন্তু উভয়ের মাঝখানে এতটুকু যায়গা যেন খালি না থাকে যে দু'টি কাতার হতে পারে।

৪. কেউ একাকী ফরয নামায পড়ে নিয়েছে এবং জামায়াতে ফরয নামায হচ্ছে তখন তার উচিত জামায়াতে শামিল হওয়া। তবে ফজর, আসর এবং মাগরিব শরীক হবে না। এ জন্য যে, ফজর এবং আসরের পর নামায মাকরুহ। মাগরিবে শরীক না হওয়ার কারণ তার এ দ্বিতীয় নামায নফল হবে। আর নফল নামায তিন রাকায়াত হওয়া বর্ণিত নেই।

৫. কেউ ফরয নামায পড়ছে, তারপর সেই নামায জামায়াতে হওয়া শুরু হলো, তখন তার উচিত তার নামায ছেড়ে দিয়ে জামায়াতে শরীক হওয়া। তাতে ফজরের নামাযে যদি দ্বিতীয় রাকায়াতের সিজদা করে থাকে, এবং অন্য কোন ওয়াক্তের নামাযে তৃতীয় রাকায়াতের সিজদা করে থাকে, তাহলে নামাজ পুরা করবে। নামায পুরা করার পর যদি দেখে যে, জামায়াত শেষ হয়নি, তাহলে যোহর এবং এশার নামায যদি হয় তাহলে জামায়াতে শরীক হবে।

৬. যদি কেউ নফল নামায শুরু করে থাকে এবং ফরযের জামায়াত দাঁড়ায় তাহলে সে দু'রাক্‌য়াত পড়ে সালাম ফেরাবে।

৭. যদি কেউ যোহরের অথবা জুম্‌আর প্রথম চার রাক্‌য়াত সুন্নাত মুয়াক্কাদাহ শুরু করে থাকে এবং এমন সময় ইমাম ফরয নামাযের জন্যে দাঁড়ালো, তখন তার উচিত দুরাকায়াত সুন্নাত পড়ে সালাম ফেরানো। ফরযের পর ঐ সুন্নাত পুরা করবে।

৮. যখন ইমাম ফরয নামায পড়ার জন্যে দাঁড়িয়ে যাবে তখন সুন্নাত পড়া উচিত নয়। তবে যদি বিশ্বাস হয় যে, ফরযের কোন রাক্‌য়াত বাদ পড়বে না, তাহলে সুন্নাত পড়া যাবে। অবশ্য ফজরের সুন্নাতের যেহেতু খুব বেশী তাকীদ আছে,

সে জন্য জামায়াতে এক রাক্‌য়াত পাওয়ারও যদি আশা থাকে তাহলে সুন্নাত পড়বে। এক রাক্‌য়াত পাওয়ার যদি আশা না থাকে তাহলে পড়বে না।

৯. যখন জামায়াতে ফরয নামায হচ্ছে তখন কেউ সুন্নাত পড়তে চাইলে মসজিদ থেকে আলাদা জায়গায় পড়বে। তা সম্ভব না হলে জামায়াতের কাতার থেকে আলাদা হয়ে মসজিদের এক কোণে পড়বে। তাও সম্ভব না হলে সুন্নাত পড়বে না। এ জন্য যেখানে ফরয নামাযের জামায়াত হয় সেখানে অন্য কোন নামায মাকরূহ তাহ্‌রীমী।

১০. যদি কোন সময় বিলম্ব হয়ে যায় এবং তার জন্য পুরা জামায়াত পাওয়ার আশা না থাকে। তথাপি মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়া উচিত। জামায়াতের সওয়াব আশা করা যেতে পারে বরঞ্চ জামায়াত শেষ হয়ে গেলেও আল্লাহ্‌র কাছে আশা করা যায় যে, জামায়াতের সওয়াব পাওয়া যাবে।

নবী (সাঃ) বলেন–

যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করলো, তারপর জামায়াতের আশায় মসজিদে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলো জামায়াত হয়ে গেছে। তাহলে আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর সে বান্দাহকে ঐ লোকদের মতো জামায়াতের সওয়াব দিবেন, যারা জামায়াতে শরীক হয়ে নামায আদায় করেছে। এতে করে তাদের সওয়াবে কোন কম করা হবে না– (আবু দাউদ)।

১১. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকু'তে শরীক হবে সে ঐ রাক্‌য়াত পেয়েছে মনে করা হবে। কিন্তু রুকু' না পেলে সে রাক্‌য়াত পাওয়া যাবে না।

১২. ইমাম ছাড়া একজন যদি নামাযে শরীক হয় তাহলে সাধারণ নামাযগুলোতে জামায়াত হয়ে যাবে। কিন্তু জুমার জামায়াতের জন্য প্রয়োজন ইমাম ছাড়া অন্তত: আরও দু'জন নতুবা জুমার জামায়াত হবেনা।

সিজদায়ে সহুর বয়ান

সহু অর্থ ভুলে যাওয়া। ভুলে নামাযের মধ্যে কিছু বেশী–কম হয়ে গেলে যে ত্রুটি–বিচ্যুতি হয়, তা সংশোধনের জন্যে নামাযের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরাবার আগে দু'টি সিজদা করা ওয়াজিব হয়, তাকে বলে সিজদায়ে সহু।

সহু সিজদার নিয়ম

নামাযের শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতুর' পর ডান দিকে সালাম ফেরাতে হবে।

তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যেতে হবে। নামাযের অন্যান্য সিজদার নিয়মে দু'সিজদা করে আত্তাহিয়্যাতু, দুরুদ, প্রভৃতি পড়ে দু'দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হবে।

যেসব অবস্থায় সিজদা সহু ওয়াজিব হয়

১. ভুলে নামাযের কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে, যেমন সূরা ফাতেহা পড়া ভুলে যাওয়া অথবা সূরা ফাতেহার পর কোন সূরা পড়তে ভুলে যাওয়া।

২. কোন ওয়াজিব আদায় করতে বিলম্ব হলে, ভুলে হোক কিংবা কিছু চিন্তা করতে গিয়ে হোক যেমন কোন লোক সূরা ফাতেহা পড়ার পর চুপ করে থাকলো। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবার কোন সূরা পড়লো।

৩. কোন ফরয আদায় করতে বিলম্ব হলে অথবা ফরয আগে করা হলে। যেমন, কিরায়াত করার পর রুকু' করতে বিলম্ব হলো[১] অথবা রুকুর আগেই সিজদা করা।

৪. কোন ফরয বার বার আদায় করা। যেমন দু'রুকু' পর পর করা হলো।

৫. কোন ওয়াজিবের রূপ পরিবর্তন করা হলো। যেমন সিররী নামাযে জোরে কিরায়াত করা অথবা জাহরী নামাযে আস্তে কিরায়াত করা (জামায়াতে নামাযের ক্ষেত্রে)।

সহু সিজদার মাসয়ালা

১. নামাযের ফরযের কোনটি যদি স্বেচ্ছায় ছুটে যায় অথবা ভুলে যায়, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে কোন ওয়াজিব ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে নামায নষ্ট হবে। সিজদা সহু করলেও নামায সহীহ হবে না। নামায পুনরায় পড়তে হবে।

২. এক বা একাধিক ওয়াজিব ছুটে গেলে একই বার দু'সিজদা করলেই যথেষ্ট হবে। এমন কি নামাযের সকল ওয়াজিব ছুটে গেলেও দু'সিজদা যথেষ্ট, দু'য়ের বেশী সহু সিজদা ওয়াজিব হবে না।

৩. যদি কেহ ভুলে দাঁড়ানো অবস্থায় সূরা ফাতেহার আগে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে তাহলে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। কারণ ফাতেহার আগে আল্লাহ্র হামদও সানা পড়া হয় এবং আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যেও হামদ ও সানা আছে। তবে কিরায়াতের পর অথবা দ্বিতীয় রাক্য়াতে কিরায়াতের আগে বা পরে আত্তাহিয়্যাতু পড়লে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

---

১. এখানে বিলম্বের অর্থ যে, এ সময়ের মধ্যে এক সিজদা বা রুকু' করা যায়।

৪. ভুলে কোন 'কাওমা' বাদ পড়লে অথবা দু' সিজদার মাঝখানে জালসা না হলে সহু সিজদা করা জরুরী হয়।

৫. যদি কেউ কা'দা উলা করতে ভুলে যায় এবং বসার পরিবর্তে একেবারে উঠে দাঁড়ায়, তারপর মনে পড়লে যেন বসে না পড়ে। বরঞ্চ নামায পুরা করে নিয়ম মুতাবেক সহু সিজদা করবে। আর যদি পুরাপুরি না দাঁড়ায়, সিজদার নিকটে থাকে তাহলে বসে পড়বে। তখন সহু সিজদার দরকার হবে না।

৬. যদি কেউ দু' বা চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামাযে শেষ বৈঠক ভুলে গেল এবং বসার পরিবর্তে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। এখন যদি সিজদা করার আগে তার মনে হয় তাহলে বসেই নামায পুরা করে সহু সিজদা করবে। তাতেই ফরয নামায দুরস্ত হবে। যদি সিজদা করার পর মনে হয় যে, শেষ বৈঠক করে নি, তাহলে আর বসবে না বরঞ্চ এক রাকায়াত মিলিয়ে চার রাকায়াত বা দু' রাকায়াত পুরা করবে। এ অবস্থায় সিজদা সহুর দরকার নেই। এ রাকায়াতগুলো নফল হয়ে যাবে। ফরয নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। মাগরিবের ফরযে যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে পুনরায় পঞ্চম রাকায়াত পড়বে না। চতুর্থ রাকায়াতে বসে নামায পুরা করবে। কারণ নফল নামায বেজোড় হয় না। নবী (সঃ) বলেন– নফল নামাযের রাকায়াত দুই দুই করে – (ইলমুল ফিকাহ)।

৭. সূরা ফাতেহা পড়া ভুলে গেলে অথবা দোয়া কুনুত ভুলে গেলে অথবা আত্তাহিয়্যাতু পড়া ভুলে গেলে অথবা ঈদুল ফিতর–ঈদুল আযহার অতিরিক্ত তাকবীর ভুলে গেলে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

৮. মাগরিব, এশা বা ফজরের জাহরী নামাযগুলোতে ইমাম যদি ভুলে কিরায়াত আস্তে পড়ে তাহলে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

৯. ইমামের যদি কোন ওয়াজিব ছুটে যায় এবং সহু সিজদা ওয়াজিব হয় তাহলে মুক্তাদীকেও সহু সিজদা করতে হবে। আর মুক্তাদীর যদি কোন ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে না মুক্তাদীর সহু সিজদা ওয়াজিব হবে আর না ইমামের।

১০. সূরা ফাতেহার পর যদি কেউ সূরা মিলাতে ভুলে যায় অথবা সূরা প্রথমে পড়লো পরে সূরা ফাতেহা, তাহলে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়বে এবং শেষ কা'দার পর অবশ্যই সহু সিজদা করবে।

১১. যদি ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকায়াতে অথবা এক রাকায়াতে কেউ সূরা মিলাতে ভুলে যায়, তাহলে পরের রাকায়াতগুলোতে সূরা মিলিয়ে সহু সিজদা করে নামায পুরা করবে।

১২. সুন্নাত অথবা নফল নামাযের মধ্যে সূরা মিলাতে কেউ যদি ভুলে যায় তাহলে সিজদা সহু অনিবার্য হবে।

১৩. যদি চার রাকায়াত ফরয নামাযে কেউ শেষ রাকায়াতে এত সময় পর্যন্ত বসলো যতোক্ষণে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়া যায় অথবা পুরা 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়লো। তারপর তার সন্দেহ হলো যে, এটা তার কাদায়ে উলা এবং সালাম ফেরার পরিবর্তে পঞ্চম রাকায়াতের জন্যে উঠে দাঁড়ালো। এখন যদি সিজদা করার আগে তার মনে হয়, তাহলে বসে নামায পুরা করবে এবং নিয়ম মাফিক সহু সিজদা করবে এবং সালাম ফিরাবে। আর যদি পঞ্চম রাকায়াতের সিজদা করে ফেলে তাহলে ষষ্ঠ রাকায়াত মিলিয়ে নেবে এবং সহু সিজদা করে নামায পুরা করবে। এ অবস্থায় তার ফরয নামায সহীহ্ হবে আর অতরিক্ত দু'রাকায়াত নফল গণ্য হবে।

১৪. চার রাকায়াত ফরয নামাযের শেষ দু'রাকায়াতে কোন একাকী লোক বা ইমাম যদি সূরা ফাতেহা পড়া ভুলে যায়, তাহলে সিজদা সহু ওয়াজিব হবে না। তবে যদি সুন্নাত ও নফল নামাযে ভুলে যায় তাহলে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে। এ জন্য যে, ফরয নামাযের শেষের রাকায়াতগুলোতে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব নয়। সুন্নাত নফলের প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতেহা ওয়াজিব।

১৫. যদি কেউ ভুলে এক রাকায়াতে দু'রুকু' করে অথবা এক রাকায়াতে তিন সিজদা করে অথবা সূরা ফাতেহা দু'বার পড়ে তাহলে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে। কারণ সূরা ফাতেহা একবার পড়া ওয়াজিব।

১৬. যদি 'কাদায়ে উলাতে' আত্তাহিয়্যাতুর পরে কেউ দরুদ পড়া শুরু করে এবং 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ' এর পরিমাণ পড়ে ফেলে অথবা এতটা চুপচাপ বসে থাকে, তাহলে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

১৭. যদি কোন মসবুক তার অবশিষ্ট নামায পুরা করতে গিয়ে কোন ভুল করে তাহলে শেষ বৈঠকে তার সহু সিজদা করা ওয়াজিব হবে।

১৮. কেউ যোহর অথবা আসরের ফরয নামাযের দু'রাকায়াত পড়লো, কিন্তু মনে করলো যে, চার রাকায়াত পড়েছে এবং তারপর সালাম ফিরালো। তারপর মনে হলো যে দু'রাকায়াত পড়েছে। তাহলে বাকী দু'রাকায়াত পড়ে নামায পুরা করবে এবং সহু সিজদা করবে।

১৯. কারো নামাযে সন্দেহ হলো যে, তিন রাকায়াত পড়লো, না চার রাকায়াত তাহলে এ ধরনের সন্দেহ তার যদি এই প্রথম বার ঘটনাক্রমে হয়ে থাকে এবং সাধারণত এ ধরনের সন্দেহ তার হয় না, তাহলে সে পুনরায় নামায পড়বে।

কিন্তু যদি তার প্রায়ই এরূপ সন্দেহ হয় তাহলে তার প্রবল ধারণা যেদিকে হবে সেদিকে আমল করবে। আর কোন দিকেই যদি ধারণা প্রবল না হয় তাহলে কম রাকায়াতই ধরবে। যেমন কেউ যোহর নামাযে সন্দেহ হলো যে, তিন রাকায়াত পড়লো না চার রাকায়াত এবং কোন দিকেই তার ধারণা সুস্পষ্ট হচ্ছে না, তাহলে এমন অবস্থা তিন রাকায়াতই মনে করে বাকী এক রাকায়াত পুরা করবে এবং সহু সিজদা দিবে।

২০. নামাযের সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব ছুটে গেলে সহু সিজদা দরকার হয় না। যেমন নামাযের শুরুতে সানা পড়তে কেউ ভুলে গেল, অথবা রুকু এবং সিজদার তসবিহ পড়তে গেল, অথবা রুকুতে যেতে এবং উঠতে দোয়া ভুলে গেল অথবা দুরুদ শরীফ এবং তার পরের দোয়া ভুলে গেল, তাহলে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে না।

২১. নামাযে যদি এমন ভুল হয় যার জন্যে সহু সিজদা ওয়াজিব কিন্তু সহু সিজদা না করেই নামায শেষ করা হলো। তারপর মনে হলো যে ভুলে সহু সিজদা দেয়া হয় নি। যদি মুখ কিবলার দিকে থাকে এবং কারো সাথে কথা বলা না হয় তাহলে সংগে সংগেই সহু সিজদা করে আত্তাহিয়্যাতু ও দুরুদের পর সালাম ফিরাবে।

২২. কেউ এক রাক্‌য়াতে ভুলে এক সিজদা করলো। এখন যদি কা'দায়ে আখীরা বা শেষ বৈঠক আত্তাহিয়্যাতু পড়ার আগে প্রথম রাকায়াতে অথবা দ্বিতীয় রাকায়াতে অথবা যখনই মনে হবে সিজদা করতে হবে এবং নিয়ম মাফিক সহু সিজদা দিতে হবে। যদি 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার পর সিজদার কথা মনে হয় তাহলে সিজদা আদায় করে পুনর্বার 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়তে হবে এবং সহু সিজদা করে কা'দা অনুযায়ী নামায পুরা করতে হবে।

২৩. সফরের মধ্যে কসর করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কেউ যদি ভুলে কসর না করে পুরা চার রাক্‌য়াত পড়লো, তাহলে এ অবস্থায় শেষ রাকায়াতে নিয়ম মুতাবিক সহু সিজদা করা ওয়াজিব হবে। এ অবস্থায় এ নামায এভাবে সহীহ হবে যে, প্রথম দু'রাকায়াত ফরয এবং শেষ দু'রাক্‌য়াত নফল হবে।

কসর নামাযের বয়ান

শরীয়ত মুসাফিরকে সফরে নামায সংক্ষিপ্ত করার সুযোগ দিয়েছে। অর্থাৎ যেসব নামায চার রাকায়াতের তা দু'রাকায়াত পড়বে। আল্লাহ্ বলেন–

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ الاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ (النساء : ١٠١)

–যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ করতে বেরুবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে কোন দোষ নেই– (নিসা ঃ ১০১)।

এ একটি সদকা যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন, এ সদকা তোমরা গ্রহণ কর– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি)।

কসর নামাযের হুকুম

আপন বস্তি বা জনপদ থেকে বের হওয়ার পর মুসাফিরের জন্যে নামায কসর করা ওয়াজিব। পুরা নামায পড়লে গুনাহগার হবে–(ইলমুল ফেকাহ, ২য় খন্ড পৃঃ ১৩০, দূররে মুখতার প্রভৃতি)।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলেন–আমি নবী (সঃ), আবু বকর (রা), ওমর (রা) এবং ওসমান (রা) এর সাথে সফর করেছি। আমি কখনো দেখিনি যে, তাঁরা দু'রাকয়াতের বেশী ফরয নামায পড়েছেন -(বুখারী. মুসলিম)। কসর শুধু ঐসব নামাযে যা চার রাকায়াত ফরয, তাতে কোন কম করা যাবে না। ফজরের দু এবং মাগরিবে তিন রাকায়াতই পড়তে হবে।

সফরে সুন্নাত এবং নফলের হুকুম

ফজর নামাযের সুন্নাত ত্যাগ করা ঠিক নয়। মাগরিবের সুন্নাতও পড়া উচিত, বাকী ওয়াক্তের সুন্নাতগুলো সম্পর্কে না পড়ার এখতিয়ার আছে। তবে সফর চলতে থাকলে শুধু ফরয পড়া ভালো এবং সুন্নাত ছেড়ে দেবে। সফরের মধ্যে কোথাও কোথাও অবস্থান করলে পড়ে নেবে। বিতর পুরা পড়তে হবে- কারণ তা ওয়াজিব। সুন্নাত, নফল ও বিতরের নামাযের কসর নেই। বাড়ীতে যত রাকায়াত পড়া হয় তা পড়তে হবে।

কসরের দূরত্ব

যদি কেউ তার বাড়ী থেকে এমন স্থানে সফর করার জন্য বের হয় যা তার বাড়ী বা বস্তি থেকে তিন দিনের দূরত্ব হয়, তাহলে তার কসর করা ওয়াজিব। তিন দিনের দূরত্ব আনুমানিক ৪৮ মাইল।[১] যদি কেউ অন্তত ৪৮ মাইল সফর করার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয় তা সে পায়ে হেঁটে তিন দিনে সেখানে পৌছুক অথবা দ্রুতগামী যানবাহনে কয়েক ঘন্টায় পৌছুক সকল অবস্থায় তাকে নামায কসর পড়তে হবে।

কসর শুরু করার স্থান

সফরে রওয়ানা হওয়ার পর মুসাফির যতোক্ষণ তার অধিবাসের ভেতর থাকে, ততোক্ষণ পুরা নামায পড়বে। অধিবাস বা বস্তির বাইরে চলে গেলে কসর পড়বে। বস্তির ষ্টেশন যদি তার বাসস্থানের ভেতর হয় তাহলে কসর পড়বে না, পুরা নামায পড়বে। আর যদি বাইরে হয় তাহলে কসর পড়বে।

কসরের মুদ্দৎ

মুসাফির যতোদিন তার 'ওয়াতনে আসলী' বা মূল বাসস্থানে ফিরে না আসবে ততোদিন কসর পড়তে থাকবে। সফরকালে কোথাও যদি পনেরো দিন বা তার বেশী সময় অবস্থানের ইচ্ছা করে তাহলে সে স্থান তার 'ওয়াতনে ইকামত' বলে বিবেচিত হবে। 'ওয়াতনে ইকামতে' পুরা নামায পড়তে হবে। যদিও পনেরো দিন থাকার নিয়ত করার পর তার কম সময় সেখানে অবস্থান করে। আর কোন স্থানে পনেরো দিনের কম থাকার ইচ্ছা কিন্তু কোন কারণে সেখানে বার বার আটকা পড়ছে অর্থাৎ যাবে যাবে করেও যাওয়া হচ্ছে না তাহলে কসরই পড়বে। এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে যদি কয়েক মাস অতীত হয় তবুও সে স্থান 'ওয়াতনে ইকামত' বলে বিবেচিত হবে না এবং সেখানে কসরই পড়তে হবে।

কসরের বিভিন্ন মাসয়ালা

১. যদি সফরকালে ভুলে কেউ চার রাকায়াত নামায পড়ে ফেলে এমনভাবে যে, দ্বিতীয় রাকায়াতে বসে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়েছে, তাহলে সহু সিজদা করে নেবে। এ অবস্থায় দু'রাকায়াত ফরয এবং দু'রাকায়াত নফল হবে। এ নামায দুরস্ত হবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় রাকায়াতে বসে 'আত্তাহিয়্যাতু' না পড়ে থাকে তাহলে এ চার রাকায়াত নফল হবে। কসর নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

---

১. লেখক ৩৬ মাইল উল্লেখ করেছেন। প্রসিদ্ধ মত ৪৮ মাইল বিধায় এখানে তা উল্লেখ করা হয়েছে। (সংকলক)

২. সফরকালে যদি কয়েক স্থানে অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে-কোথাও পাঁচ দিন, কোথাও দশ দিন, কোথাও বার দিন, তবে কোথাও পনেরো দিন থাকার ইচ্ছা নেই- তাহলে পুরা সফরে কসর পড়তে হবে।

৩. কোন মহিলা যদি তার স্বামীর সাথে অথবা কোন কর্মচারী তার মালিকের সাথে অথবা কোন পুত্র তার পিতার সাথে সফর করে, অর্থাৎ সফরকারী যদি এমন কোন ব্যক্তি হয় যে, অপরের অধীন এবং অনুগত, তাহলে এ অধীন ব্যক্তির ইচ্ছা বা নিয়ত মূল্যহীন হবে। এ অবস্থায় সে মহিলা অথবা কর্মচারী অথবা পুত্র যদি কোথাও পনেরো দিন থাকার নিয়তও করে তথাপি সে মুকীম হতে পারবে না, যদি তার স্বামী অথবা মুনিব অথবা পিতা ১৫ দিনের নিয়ত না করে।

৪. মুকীম মুসাফিরের পিছনে নামায পড়তে পারে। মুসাফির ইমামের উচিত হবে ঘোষণা করে দেয়া যাতে করে ইমাম দু'রাকায়াত পড়ে সালাম ফিরালে মুকীম মুক্তাদী উঠে বাকী দু'রাকায়াত পুরা করতে পারে।

৫. মুসাফিরের জন্যে মুকীম ইমামের পেছনে নামায পড়া দুরস্ত আছে। এ অবস্থায় ইমামের অনুসরণে চার রাকায়াত ফরযই পড়বে, কসর করতে হবে না।

৬. যদি কেউ কোথাও অবস্থান সম্পর্কে কিছু ঠিক করে নি অথবা ১৫ দিনের কম নিয়ত করেছে কিন্তু নামাযের মধ্যে ১৫ দিনের বেশী থাকার নিয়ত করলো, তাহলে সে ব্যক্তি নামায পুরা পড়বে, কসর করবে না।

৭. সফরে যেসব নামায কাযা হবে বাড়ী ফেরার পর তা কসর কাযা পড়বে। ঠিক তেমনি বাড়ী থাকাকালীন কিছু নামায কাযা হলো এবং হঠাৎ সফরে যেতে হলো, তাহলে সফরে কাযা নামায পুরাই পড়তে হবে কসর পড়বে না।

জুম্‌আর নামাযের বিবরণ

জুম্‌আর দিনের ফযীলত

আল্লাহর নিকটে জুম্‌আর দিন সমস্ত দিনের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ দিনের মধ্যে এমন বিশিষ্ট গুণের সমাবেশ রয়েছে যা অন্য দিনগুলোর মধ্যে নেই, এ জন্য এ দিনটিকে বলা হয় জুমআ (বহুর সমাবেশ)। এ দিনে মুসলমানদের বিরাট সমাবেশ হয়। কোন কেন্দ্রীয় স্থানে তারা আল্লাহর যিকির ও

ইবাদতের জন্যে একত্র হয় এবং এক বিরাট জামায়াতে জুম্‌আর নামায আদায় করে। এজন্য নবী (সঃ) এ দিনকে মুসলমানদের ঈদের দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১] জুম্‌আ আসলে একটি ইসলামী পরিভাষা। ইহুদীদের শনিবার ছিল ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট। কারণ ঐদিন আল্লাহ্ বনী ইসরাইলকে ফেরাউনের গোলামী থেকে রক্ষা করেন। ঈসায়ীগণ নিজেদেরকে ইহুদীদের থেকে আলাদা করার জন্যে রবিবার দিনকে নিজেরাই নির্ধারণ করে। অথচ এর কোন নির্দেশ না হযরত ঈসা (আ) দিয়েছেন, আর না ইঞ্জিলে এর কোন উল্লেখ আছে। ঈসায়ীদের আকীদাহ এই যে, শুলে জীবন দেয়ার পর হযরত ঈসা (আ) কবর থেকে উঠে আসমানে চলে যান। সেটা ছিল রবিবার। অতঃপর ৩২১ খৃস্টাব্দে রোমীয় সাম্রাজ্য এক সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে এ দিনটিকে ছুটির দিন বলে নির্ধারিত করে। ইসলাম এ দু'টি মিল্লাত থেকে মুসলিম মিল্লাতকে আলাদা করার জন্যে এ দু'টি দিন বাদ দিয়ে জুম্‌আর দিনকে সামষ্টিক ইবাদতের জন্য গ্রহণ করে। এর ভিত্তিতেই এ দিনটিকে মুসলমানদের ঈদের দিন বলা হয়।

নবী (সঃ) জুম্‌আর আয়োজন বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু করতেন এবং বলতেন–

জুম্‌আর রাত এবং জুমার দিন উজ্জ্বল দিন (মিশকাত)।

জুম্‌আর নামাযের হুকুম, ফযীলত ও গুরুত্ব

জুম্‌আর নামায ফরযে আইন। কুরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতের দ্বারা এর ফরয হওয়া অকট্যভাবে প্রমাণিত। উপরন্তু ইসলামের প্রতীক হিসেবেও তার বিরাট মর্যাদা। এর ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী ইসলামের গন্ডির বহির্ভুত। অবহেলা করে তা পরিত্যাগ করলে সে ফাসেক হয়ে যাবে।

কুরআনে বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

(الجمعه : ٩)

---

১. একবার জুম্‌আর খুৎবা দেয়া কালে নবী (সঃ) বলেন, –মুসলমানগণ! আজ এমন একদিন যাকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ঈদের দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ জন্য তোমরা এদিনে গোসল কর, যার খুশবু সংগ্রহ করা সম্ভব, সে তা ব্যবহার করবে। এদিনে তোমরা অবশ্যই মিসওয়াক করে দাত-মুখ পরিষ্কার করবে। (মোয়াত্তা, ইবনে মাজাহ)।

হে মুমিনগণ, যখন জুম্‌আর দিনে জুম্‌আর নামাযের জন্যে আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্যে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা বন্ধ করে দাও। এটা তোমাদের জন্যে ভালো, যদি তোমরা বুঝে সুঝে কাজ কর। (সূরা জুমআ ঃ ৯)

আল্লাহ্‌র যিকির বলতে খোতবা এবং নামায বুঝানো হয়েছে। দৌড়ানের অর্থ পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে এবং মনোনিবেশ সহকারে যত শীঘ্র সম্ভব মসজিদে পৌছাবার চেষ্টা করা। এ অসাধারণ তাকীদের মর্ম এই যে, অন্যান্য নামায তো জামায়াত ব্যতীতও হতে পারে, ওয়াক্ত চলে গেলে কাযা করা যেতে পারে। কিন্তু বিনা জামায়াতে জুম্‌আর নামায হবে না এবং সময় চলে গেলে এর কাযাও নেই। এ জন্যে আযান শুনার পর যাদেরকে মুমিন বলে সম্বোধন করা হচ্ছে তাদের কোন বেচা-কেনার অথবা অন্য কোন কাজে লিপ্ত থাকা কিছুতেই জায়েয নয়। প্রকৃতপক্ষে এ সময়টুকু আল্লাহ্‌র দরবারে দাঁড়ানো ও সিজদা করা এবং আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল থাকার চিরন্তন ফায়দা দুনিয়ার ব্যস্ততার সাময়িক ও স্থিতিহীন ফায়দার চেয়ে লক্ষ গুণে বেশী। তবে শর্ত এই যে, মানুষ জেনে বুঝে পূর্ণ অনুভূতির সাথে যেন এ কাজ করে।

নবী পাক (সঃ) বলেন-

* জুম্‌আর নামায জামায়াতসহ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। শুধু গোলাম, স্ত্রীলোক, নাবালেগ এবং রোগীর জন্যে নয়- (আবু দাউদ)।

* যে আল্লাহ্‌ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তার উপর জুমআর নামায অপরিহার্য। তারপর সে যদি কোন খেলাধুলা. তামাসা অথবা ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে এ নামায থেকে বেপরোয়া হয় তাহলে আল্লাহ্‌ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন কারণ তিনি পাক ও অমুখাপেক্ষী-(দারেকুতনী)।

* যদি কেউ বিনা কারণে জুম্‌আর নামায ত্যাগ করে তার নাম মুনাফিক হিসাবে এমন কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হবে যা কিছুতেই মিটানো যাবে না, আর না পরিবর্তন করা যাবে –(মিশকাত)।

* আমার মন বলছে যে, আমার বদলে আর কাউকে নামায পড়াতে দেই আর নিজে ঐসব লোকের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেই যারা জুম্‌আর নামাযে না এসে বাড়ী বসে আছে - (মুসলিম)।

* হযরত ইবনে ওমর (রা) এবং হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেছেন যে, তাঁরা নবী (সঃ) কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে শুনেছেন–

লোকের উচিত যে, তারা যেন জুম্আর নামায ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে; নতুবা আল্লাহ্ তাদের দিলে মোহর মেরে দেবেন। তারপর তারা অবহেলায় মগ্ন হয়ে থাকবে- (মুসলিম)।

* যে ব্যক্তি জুম্আর নামাযের আযান শুনলো অতঃপর নামাযে এলো না, তারপর দ্বিতীয় জুম্আর আযান শুনেও এলো না এবং এভাবে ক্রমাগত তিন জুমায় এলো না তার দিলে মোহর মেরে দেয়া হয় এবং তার দিলকে মুনাফিকের দিলে পরিণত করা হয়- (তাবারানী)।

আল্লামা ইবনে হাম্মাম বলেন-

জুমআ এমন, একে ফরয করেছে কুরআন এবং সুন্নাহ। যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে তার কুফরীর উপর উম্মতের ইজমা রয়েছে- (ফতহুল কাদীর, ১ম খন্ড, পৃঃ৪০৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-

যে ব্যক্তি অবহেলা করে ক্রমাগত কয়েক জুমা ত্যাগ করবে সে ইসলামকে পেছনে নিক্ষেপ করলো- (ইলমুল ফেকাহ)।

নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুম্আর দিনে গোসল করলো, তার পাক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পুরাপুরি ব্যবস্থা করলো, তারপর তেল এবং খুশবু লাগালো এবং বেলা গড়ার সাথে সাথে আউয়াল ওয়াক্তে মসজিদে গিয়ে পৌঁছলো এবং দু'জনকে পরস্পর থেকে হটিয়ে দিল না অর্থাৎ তাদের কাঁধ ও মাথার উপর দিয়ে কাতার ডিঙিয়ে অথবা দু'জন বসে থাকা লোকের মাঝখান দিয়ে বসে পড়ায় ভুল করলো না, বরঞ্চ যেখানে জায়গা পেলো সেখানেই চুপচাপ বসে পড়লো এবং সুন্নাত নামায প্রভৃতি পড়লো যা আল্লাহ্ তার অংশে লিখে রেখেছেন, তারপর খতীব যখন মিম্বরে এলেন তখন নীরবে বসে খোতবা শুনতে লাগলো তাহলে এমন ব্যক্তির ঐসব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে যা সে বিগত জুম্আ থেকে এ জুম্আ পর্যন্ত করেছে-(বুখারী)।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন জুম্আয় আগমনকারীদের তিন প্রকার ভূমিকা হয়ে থাকে-

১. একদল ঐসব লোক যারা বেহুদা কথা-বার্তায় লেগে যায়। তাদের অংশে এসব বেহুদা কথা-বার্তা ব্যতীত আর কিছুই পড়ে না।
২. দ্বিতীয় ঐসব লোক যারা এসে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে থাকে। আল্লাহ্ চাইলে তাদের দোয়া কবুল করবেন আর না চাইলে করবেন না।

৩. তৃতীয় ঐসব লোক যারা এসে চুপচাপ বসে যায়, না তারা মুসলমানদের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে যায়, আর না তারা কারো মনে কোন কষ্ট দেয়, তাহলে এদের এ নেক আমল আগামী জুমআ এবং তারপর তিন দিন পর্যন্ত করা সকল গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়- (আবু দাউদ)।

যেমন আল্লাহ্ বলেন–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا - (انعام : ١٦٠)

যে ব্যক্তি নেক আমল করে সে তার দশগুণ প্রতিদান পায়। (আন্আম ঃ ১৬০

নবী (সঃ) আরও বলেন–

যে ব্যক্তি জুমার দিন ভাল করে গোসল করে, সকাল সকাল মসজিদে যায়, পায়ে হেঁটে যায়, কোন বাহনে চড়ে নয়, তারপর নিশ্চিত মনে খোতবা শুনে এবং খোতবা চলাকালে কোন বাজে কাজ করে না, তাহলে এমন ব্যক্তি তার প্রতি কদমের পরিবর্তে এক বছরের ইবাদতের প্রতিদান পাবে- এক বছরের নামাযের এবং এক বছরের রোযার - (তিরমিযী)।

জুম্আর নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

জুম্আর নামায সহীহ এবং ওয়াজিব হওয়ার জন্যে শরীয়ত কিছু শর্ত আরোপ করেছে। যদি এসব শর্ত পাওয়া না যায়, তাহলে জুম্আ ওয়াজিব হবে না। এসব শর্ত আবার দু'প্রকারের। কিছু শর্ত এমন যা নামাযের মধ্যেই থাকা জরুরী। তাকে 'শারায়েতে ওজুব' বলে। কিছু শর্ত এমন যা বাইরে পাওয়া জরুরী । এসবকে বলে 'শারায়েতে সিহ্হাত'।

শারায়েতে ওজুব

জুম্আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্যে পাঁচটি শর্ত

ক) পুরুষ হওয়া। নারীর জন্যে জুম্আ ওয়াজিব নয়।

খ) স্বাধীন হওয়া। গোলামের উপর ওয়াজিব নয়।

গ) বালেগ এবং জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। নাবালেগ এবং পাগলের উপর ওয়াজিব নয়।

ঘ) মুকীম হওয়া। মুসাফিরের জন্যে ওয়াজিব নয়।

ঙ) সুস্থ হওয়া। রোগী ও অক্ষমের জন্যে ওয়াজিব নয়। রোগী হওয়ার অর্থ এই যে, যে মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারে না। কিন্তু যারা চলাফেরা করে এবং মসজিদ পর্যন্ত যেতে সক্ষম তাদের উপর জুমআর নামায ওয়াজিব।

অক্ষম দু'প্রকারের। প্রথমত যার দৈহিক কোন অক্ষমতা রয়েছে। যেমন, অন্ধ, বা এমন বৃদ্ধ যে চলতে পারে না। দ্বিতীয়ত ঐসব লোক যাদের বাহির থেকে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ঝড়-তুফান, বৃষ্টি, বাদল, পথে কোন হিংস্র জানোয়ার, শত্রু প্রভৃতির ভয় হওয়া।

শর্ত পাওয়া না গেলে জুম্আর নামাযের হুকুম

জুম্আর নামায তো এমন ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব যার মধ্যে উপরের পাঁচটি শর্ত পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি এসব শর্ত বা কিছু পাওয়া না যায় এবং সে যদি জুম্আর নামায পড়ে তাহলে তার যোহর নামায পড়ার দরকার হবে না। যেমন কোন মহিলা মসজিদে গিয়ে জুম্আর নামায পড়লো, অথবা মুসাফির বা অক্ষম ব্যক্তি জুমার নামায পড়লো, তাহলে তার নামায দুরস্ত হবে এবং যোহর নামায পড়তে হবে না।

শারায়েতে সিহ্হাত (شرائط صحت)

জুমআর নামায সহীহ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত। এ পাঁচটি শর্ত পুরা না করলে জুমআর নামায দুরুস্ত হবে না। এসব শর্ত পূরণ ছাড়া কেউ জুমআ পড়লে তার যোহর নামায পড়ার প্রয়োজন হবে। শর্তগুলো হলো ঃ

১. মিসরে জামি' বা শহর হওয়া।[১]

২. যোহরের ওয়াক্ত হওয়া।

৩. খুতবা হওয়া।

৪. জামায়াত হওয়া।

৫. সর্ব সাধারণের জন্যে জুমআ আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসার অনুমতি থাকা।

জুম্আর সুন্নাতসমূহ

জুম্আর সুন্নাত আট রাকায়াত এবং সব সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। দু'রাকায়াত ফরযের পূর্বে এক সালামে চার রাকায়াত এবং ফরযের পর এক সালামে চার রাক্আত। এ হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (রা)-এর মত।

সাহেবাইন (র) (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) বলেন, জুমআর দশ সুন্নাত,

১. উলামায়ে কেরামের মতে বাংলাদেশের গ্রামগুলো মিসরে জার্মির পর্যায়ভুক্ত। তাই এখানে জুমআর নামায পড়তে হবে।

ফরযের পূর্বে চার রাকায়াত এবং পরে ছ'রাকায়াত। চার রাকায়াত এক সালামে পরে দু'রাকায়াত এক সালামে।

জুমৃআর আহ্কাম ও আদব

১. জুম্আর দিন পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা, চুল এবং নখ কাটা, সাধ্যমত ভালো পোশাক পরিধান করা, খুশবু লাগানো এবং প্রথমে জামে মসজিদে গিয়ে হাযির হওয়া সুন্নাত।

যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে, ভালো কাপড় পরবে, সুযোগ হলে খুশবু লাগাবে, জুমআর নামাযে আসবে, লোকের ঘাড়ের উপরে দিয়ে ডিঙিয়ে যাবে না, অতঃপর নামায পড়বে যা আল্লাহ্ ভাগ্যে লিখে রেখেছেন, ইমাম আসার পর থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ-চাপ থাকবে, তাহলে আগের জুমা থেকে এ জুমা পর্যন্ত তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে- (ইলমুল ফেকাহ, ২য় খন্ড)।

২. ব্যবস্থা সত্ত্বেও ভুলে অথবা কোন কারণে জুম্আ পড়তে না পারলে যোহরের চার রাকায়াত ফরয পড়তে হবে এবং কিছু সদকা খয়রাত করে দেয়া উচিত। এমনি কোন রোগীর সেবা শুশ্রুষার কারণে, অথবা ঝড় তুফান অথবা শত্রুর ভয়ে জুম্আর নামায পড়তে না পারলে যোহর আদায় করতে হবে।

৩. যে খুতবা দেয় তারই নামায পড়ানো ভালো। কিন্তু কোন কারণে অন্য কেউ নামায পড়িয়ে দিলেও দুরস্ত হবে- (দূররে মুখতার)।

তবে জুম্আর নামায সেই পড়াবে যে খুতবা শুনেছে। এমন ব্যক্তি যদি নামায পড়ায় যে খুতবা শুনেনি তাহলে নামায হবে না।

৪. বস্তির (মহল্লার) সকল লোকের একই জামে' মসজিদে একত্র হয়ে জুমার নামায আদায় করা ভালো। তবে শহরে কয়েক মসজিদে নামায পড়াও জায়েয-(বাহরুর রায়েক)।

৫. শহরে অথবা এমন বস্তিতে যেখানে জুমার নামায হয়, সেখানে জুমার আগে যোহর নামায পড়া হারাম (ইলমুল ফিকাহ)।

৬. রোগী এবং অক্ষম ব্যক্তিগণ- যাদের উপর জুম্আ ওয়াজিব নয়, জুম্আর দিন

যোহর নামায পৃথকভাবে পড়বে। এ ধরনের লোকের জুম্‌আর দিন যোহর নামায জামায়াতে পড়া মাকরুহ্‌ তাহরীমি -(দুররে মুখতার)।

৭. খুতবার তুলনায় জুমার নামায দীর্ঘ হওয়া উচিত। নবী (সঃ) বলেন- জুম্‌আর নামায লম্বা এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া এ কথারই নিদর্শন যে,খতীব দীনের গভীর জ্ঞান এবং দূরদর্শিতা রাখেন- (মুসলিম)।

৮. যদি কোন মসবুক শেষ বৈঠকে এসে জামায়াতে শামিল হয়ে যায় অথবা সহু সিজদার পর তাশাহহুদে এসে শরীক হয়, তবুও তার জুম্‌আর নামায দুরস্ত হবে। ইমাম ফেরার পর দাঁড়িয়ে দু'রাকায়াত আদায় করবে।

৯. জুম্‌আর আয়োজন বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু করা উচিত। নবী (সঃ) বৃহস্পতিবার থেকেই আয়োজন শুরু করে দিতেন- (মিশকাত)।

১০. জুম্‌আর দিন, যিকির, তসবীহ, তেলাওয়াতে কুরআন, দোয়া, এস্তেগফার, দান-খয়রাত, রোগীর সেবা, জানাযায় শরীক হওয়া, কবরস্থান যিয়ারত এবং অন্যান্য নেক কাজ করার বেশী আয়োজন করা উচিত। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন- পাঁচটি নেক আমল এমন যে, কেউ যদি একদিনে তা করে তাহলে আল্লাহ্‌ তাকে বেহেশতবাসী করবেন-

১- রোগীর সেবা-শুশ্রুষা করা

২- জানাযায় শরীক হওয়া

৩- রোযা রাখা

৪- জুম্‌আর নামায পড়া

৫- গোলাম আযাদ করা

নবী (সঃ) আরো বলেন-

জুম্‌আর দিন একটি সময় এমন আছে যে, বান্দাহ্‌ তখন যে দোয়াই করে তা কবুল হয়- (বুখারী)।

এ সময়টি কখন সে বিষয়ে আলেমদের কয়েক প্রকার উক্তি আছে, যার মধ্যে দু'টি অধিকতর সহীহ বলে স্বীকার করা হয়েছে। একটি হচ্ছে যখন ইমাম খুতবার জন্য মিম্বরে আসবেন তখন থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় জুম্‌আর দিনের

শেষ মুহূর্তগুলো যখন সূর্য ডুবতে থাকে। এ দু'সময়ে দোয়ার ব্যবস্থা করা সমীচীন।

১১. জুম্আর নামাযের অনেক আগে মসজিদে যাওয়া মুস্তাহাব। নবী (সঃ) বলেন- যেমন করে পাক হওয়ার জন্য লোক গোসল করে তেমনিভাবে কেউ যদি জুম্আর দিন ভালোভাবে গোসলের ব্যবস্থা করলো এবং প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে পৌছলো, সে যেন একটি উট কুরবানী করলো। তারপর যে পৌছলো সে যেন একটি গরু কুরবানী করলো, তারপর যে পৌছলো সে যেন একটি শিং ওয়ালা মেষ কুরবানী করলো, তারপর যে পৌছলো সে যেন একটি ডিম কুরবানী করলো, তারপর যখন খতীব খুতবার জন্যে বেরিয়ে আসে, তখন ফেরেশতাগণ দরজা ছেড়ে দেন এবং হাজিরা বই বন্ধ করে খুতবা শুনার জন্যে এবং নামায পড়ার জন্যে মসজিদের ভেতর বসে পড়েন- (বুখারী, মুসলিম)।

১২. মসজিদে যেখানে স্থান পাওয়া যায় সেখানেই বসা উচিত, কারো মাথা ও ঘাড় ডিঙিয়ে যাওয়া মাকরুহ। এতে লোকের কষ্ট হয়, শরীর এবং মনেও। তাদের একাগ্রতাও নষ্ট হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন - যে ব্যক্তি প্রথম কাতার ছেড়ে দ্বিতীয় কাতারে এ জন্য দাঁড়ায় যে, তার মুসলমান ভাইদের কোন কষ্ট না হয় তাহলে আল্লাহ্ তাকে প্রথম কাতারের লোকের দ্বিগুণ সওয়াব দেবেন- (তাবারানী)।

১৩. জুম্আর দিনে বেশী বেশী নবী (সঃ)- এর উপর দরুদ পড়া মুস্তাহাব। নবী (সঃ) বলেন-

তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন জুমার দিনে আদম (আঃ) পয়দা হন এবং এই দিনেই তার ইন্তেকাল হয়। এ দিনে কেয়ামত হবে। এ জন্য এদিনে তোমরা বেশী বেশী করে আমার উপর দরূদ পাঠাও। কারণ তোমাদের দরূদ ও সালাম আমার কাছে পেশ করা হয়। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার দেহ তো পচে গলে বিলীন হয়ে যাবে। নবী (সঃ) বলেন, আল্লাহ্ নবীদের দেহ ভক্ষণ করা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন- (আবু দাউদ)।

জুম্‌আর নামায এবং খুতবায় মাইকের ব্যবহার

খুতবার সময়ে প্রয়োজনে মাইক ব্যবহার জায়েয।

নামাযের প্রয়োজন হলে মাইক ব্যবহার করতে দোষ নেই।[১]

জুম্‌আর আযানের পরে বেচা-কেনা নিষিদ্ধ

জুমআর আযান শুনার সাথে সাথে সব কারবার বেচা-কেনা বন্ধ করে খুতবা শুনার জন্য এবং নামাযের জন্য সেজেগুজে রওয়ানা হওয়া উচিত। এ জন্য যে, জুম্‌আর আযানের পর বেচা কেনা হারাম হয়ে যায়। কুরআনে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِیَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ـ (الجمعة : ٩)

হে মুমিনগণ! জুমআর দিন যখন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হবে তখন আল্লাহর যিকিরের জন্যে দ্রুত অগ্রসর হও এবং কেনা-বেচা বন্ধ করে দাও। (আল-জুমুয়াহ ঃ ৯)।

তাফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একমত যে ذِكْرُ اللّٰهِ এর অর্থ খুতবা অথবা খুতবা এবং নামায উভয়ই। এবং نودى বলতে যে আযান বুঝায় তা হলো সেই আযান যা খুতবার আগে দেয়া হয়। অনেক পূর্বে যে আযান দেয়া হয় তা নয়। হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা) বলেন যে, নবী (সঃ)-এর যামানায় শুধু একই আযান দেয়া

---

১. মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব এ ব্যাপারে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন- ফকীহগণের বর্ণিত বিশ্লেষণ এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর কিবলা পরিবর্তনের আমল থেকে সুস্পষ্ট যুক্তি পাওয়া যায় যে, এতে নামায নষ্ট হওয়ার হুকুম দেয়া যায় না- (আধুনিক যন্ত্রাদি সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম, পৃঃ ৮৯)।

আল্লামা মওদূদী (র) মাইকে নামায শুধু জায়েযই নয় বরং উত্তম হওয়া সম্পর্কে দলীল দিতে গিয়ে বলেন- এসব যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতেই আমি নামাযে মাইক ব্যবহার শুধু জায়েয নয় বরং উত্তম মনে করি। আমার মন সায় দেয় যে, যদি নবী (সঃ)-এর যমানায় এসব যন্ত্র থাকতো তাহলে তিনি অবশ্যই নামায, আযান এবং খুতবায় তা ব্যবহার করতেন। যেমন তিনি খন্দকের যুদ্ধে ইরানী পদ্ধতিতে খন্দক খনন করাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন–(তাফহীমাত, ২য়, পৃঃ ৩৮০)

হতো এবং তা দেয়া হতো যখন খতীব মিম্বরে গিয়ে বসতেন, আরপর হযরত আবুবকর (রা) এবং হযরত ওমরের (রা.) সময় যখন লোকসংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল, তখন তাঁরা অতিরিক্ত আর একটা আযান চালু করেন। সে আযান মদিনার বাজারে তাঁদের বাসগৃহ 'যাওরা' থেকে দেয়া হতো (বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী)।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী তাঁর তাফসীরে বলেন, نُودِيَ বলতে সেই আযান বুঝায় যা ইমামের সামনে দেয়া হয়। তার আগের আযান হযরত ওসমান (রা)-এর যমানায় সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর ঐকমত্যে দেয়ার রীতি চালু হয়।

অক্ষম ও রোগীর নামায

১. রোগ যতোই কঠিন হোক, যতোদূর সম্ভব নামায ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা উচিত। নামাযের সকল আরকান আদায় করার শক্তি না থাক, যে আরকান আদায় করার শক্তি হোক, অথবা ইশারায় আদায় করার শক্তি হোক, তবুও নামায ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা উচিত।[১]

২. যথাসাধ্য দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে। সমস্ত নামায দাঁড়িয়ে থেকে সম্ভব না হলে যতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি হয় ততোক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। এমন কি কোন অক্ষম অথবা রোগী শুধু তাকবীর তাহরিমা বলার জন্যও যদি দাঁড়াতে পারে, তাহলে দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরিমা বলবে এবং তারপর বসে নামায পুরা করবে। দাঁড়িয়ে নামায পড়ার শক্তি থাকতে বসে পড়া দুরস্ত নয়।

৩. যদি কেউ দাঁড়িয়ে নামায পড়তে কিছুতেই সক্ষম না হয়, অথবা দুর্বলতার কারণে পড়ে যাওয়ার আশংকা হয়, অথবা দাঁড়ালে মাথা ঘুরে যায়, অথবা দাঁড়াতে ভয়ানক কষ্ট হয়, অথবা দাঁড়ালেও রুকূ' সিজদা করার শক্তি নেই এমন সকল অবস্থায় বসে নামায পড়বে।

৪. বসে নামায পড়া সম্ভব হলে মাসনূন তরিকায় বসতে হবে যেমন 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার সময় বসা হয়। এভাবে বসা যদি সম্ভব না হয় তাহলে যেভাবে বসা যায় সেভাবেই বসে নামায পড়বে। রুকূ' সিজদা করা সম্ভব না হলে ইশারা করে কাজ সারবে।

৫. ইশারায় রুকূ' সিজদা করতে হলে চোখ এবং মুখ দিয়ে ইশারা করা যথেষ্ট হবে না। মাথার দ্বারা ইশারা করতে হবে। রুকূ'তে একটু কম এবং সিজদাতে বেশী মাথা নত করতে হবে।

৬. সিজদা করার জন্যে মাটি পর্যন্ত কপাল ঠেকানো যদি না যায় তাহলে ইশারাই যথেষ্ট। বালিশ প্রভৃতি কপাল পর্যন্ত উচু করে তাতে সিজদা করা মাকরূহ।

---

১. দ্বীনের ফকীহগণ এতটা তাকীদ করেছেন যে, যদি কোন গর্ভবতী নারীর গর্ভবেদনা শুরু হয় এবং নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়, আর যদি সে নারীর হুশ-জ্ঞান থাকে, তাহলে দাঁড়িয়ে হোক বসে হোক যেমন করেই হোক তাড়াতাড়ি নামায পড়ে নেবে। কারণ নেফাসের রক্ত আসার পর তো নামায কাযা হয়ে যাবে এবং নামায পড়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা কাযা করা কঠিন গুনাহ।

৭. বসে নামায পড়ার শক্তিও যদি না হয়, অথবা খুব কষ্ট হয় অথবা রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা হয়, অথবা ক্ষতস্থানের ব্যাণ্ডেজ খুলে যাওয়ার ভয় হয় তাহলে শুয়ে নামায পড়বে। শুয়ে শুয়ে নমায পড়ার উত্তম পন্থা এই যে, চিত হয়ে কেবলার দিকে পা করতে হবে। তবে পা সটান না করে হাঁটু উঁচু রাখতে হবে এবং মাথার নীচে বালিশ প্রভৃতি দিয়ে মাথা একটু উঁচু করতে হবে। তারপর ইশারায় রুকূ' সিজদা করবে। তাও সম্ভব না হলে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে কিবলার দিকে মুখ ফিরাতে হবে এবং ডান কাত হয়ে নামায আদায় করবে। তাও সম্ভব না হলে যেমনভাবে সম্ভব হয় তেমনভাবে নামায পড়বে।

৮. রোগীর অবস্থা যদি এমন হয় যে, ইশারায়ও নামায পড়া সম্ভব নয়। তাহলে নামায পড়বে না। ভালো হলে কাযা পড়বে। এমন অবস্থা যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশী সময় পর্যন্ত থাকে তাহলে তার কাযা ওয়াজিব হবে না। এ নামায মাফ হবে। অথবা দুর্বলতার জন্যে জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে এবং এ অবস্থা ছয় ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত চলে, তাহলে এসব নামাযের কাযা ওয়াজিব হবে না। ঠিক তেমনি কোন সুস্থ লোক যদি হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে পড়ে এবং এভাব ছয় ওয়াক্ত পর্যন্ত থাকে তাহলে এসব নামায তার মাফ।

৯. যদি নামায পড়া অবস্থায় হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারে, বসে পড়বে, বসে না পারলে শুয়ে, অথবা ইশারা করে। মোট কথা বাকী নামায যেভাবে পারে পড়বে।

১০. চলন্ত নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ী, বিমান প্রভৃতিতে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অসুবিধা হলে বসে পড়বে। অবশ্যি দাঁড়িয়ে পড়তে কোন অসুবিধা না হলে দাঁড়িয়ে নামায পড়াই উচিত।

১১. সুস্থ অবস্থায় যদি কারো কিছু নামায কাযা হয় এবং তারপর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে রোগ সেরে যাওয়া পর্যন্ত কাযা করার অপেক্ষা করবে না। অসুস্থ অবস্থায় যেমন করেই হোক কাযা পড়ে নিতে হবে।

১২. যদি কোন রোগীর বিছানা নাপাক হয়ে যায় এবং পাক বিছানা জোগাড় করা কঠিন অথবা বিছানা বদলানো সম্ভব নয়, তাহলে নাপাক বিছানায় নামায পড়া দুরস্ত হবে।

জানাযার নামায

জানাযার নামায হচ্ছে মাইয়েতের জন্য রহমানুর রহীমের কাছে দোয়া করা। যখন কোন দোয়া মুসলমানগণ সমবেতভাবে করে তখন তা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্য জানাযার নামাযে যতো বেশী লোক হয় ততো ভালো। কিন্তু লোক বেশী জমা করার জন্যে জানাযা বিলম্ব করা ঠিক নয়।

জানাযার নামাযের হুকুম

জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। কিতাব ও সুন্নাত থেকে তার ফরয হওয়া প্রমাণিত। অতএব অস্বীকারকারী কাফের।

জানাযার নামাযের ফরয দু'টি ঃ

১. চারবার আল্লাহু আকবার বলা। প্রত্যেক তাকবীর এক রাকায়াতের স্থলাভিষিক্ত। এ নামাযে রুকু সিজদা নেই।

২. কিয়াম করা। বিনা ওযরে বসে জানাযার নামায জায়েয হবে না। কোন কিছুর উপরে আরোহণ করেও জায়েয হবে না।

জানাযা নামাযের সুন্নাত

এ নামাযে তিনটি সুন্নাত

১. আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা পড়া।

২. নবীর (সঃ) উপর দরূদ পড়া।

৩. মাইয়েতের জন্যে দোয়া করা।

নামায পড়ার নিয়ম

নামাযের জন্যে তিন কাতার সুন্নাত। লোক বেশী হলে তিন কাতারের বেশী করা যাবে কিন্তু কাতার বেজোড় হওয়া উচিত। মাইয়েতকে কিবলার দিকে সামনে রেখে তার সিনা বরাবর ইমাম দাঁড়াবেন এবং সকলে এই নিয়ত করবে ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

মাইয়েত স্ত্রীলোক হ'লে لِهٰذَا الْمَيِّتِ -এর স্থলে لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ এইরূপ নিয়ত করে একবার আল্লাহু আকবার (اَللّٰهُ اَكْبَر) বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমার মত হাত বাঁধবে এবং পড়বে-

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

–হে আল্লাহ্ সকল প্রশংসাসহ তুমি সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পাক ও পবিত্র। তোমার নাম মঙ্গল ও বরকতপূর্ণ, তোমার মহত্ব অতি বিরাট, তোমার প্রশংসা অতি মহত্বপূর্ণ এবং তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

সানা পড়ার পর আবার তাকবীর বলবে কিন্তু হাত উঠাবে না। তারপর নিম্নের দুরুদ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

তারপর তাকবীর বলে মাইয়েতের জন্যে দোয়া পড়বে। মাইয়েত যদি বালেগ হয়, (পুরুষ হোক বা স্ত্রী) তবে এই দোয়া পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِيْنَ وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثٰنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الاِيْمَانِ (ترمزي)

-হে আল্লাহ্, আমাদের জীবিত, আমাদের মৃত, আমাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের ছোটো ও বড়ো, আমাদের পুরুষ এবং নারী সকলের গুনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ্, তুমি যাদেরকে জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ, তুমি যাদের মৃত্যু দাও তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও।

তারপর চতুর্থ তাকবীর বলে দু'দিকে সালাম ফিরাবে। তাকবীর ইমাম উচ্চস্বরে বলবেন।

নাবালেগ মাইয়েতের জন্যে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ـ

–হে আল্লাহ্, এ বাচ্চাকে আমাদের নাজাত ও আরামের জন্যে আগে পাঠিয়ে দাও, তার জন্য যে শোক দুঃখ তা আমাদের প্রতিদান ও সম্পদের কারণ বানিয়ে দাও, তাকে আমাদের শাফায়াতকারী বানাও যা কবুল করা হবে।

নাবালিকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ـ

যাদের এসব দোয়া জানা নেই, তারা বলবে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

তা বলতে না পারলে শুধু, চার তাকবীর বললে নামায হয়ে যাবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনেকে তাদের প্রিয়জনদের জানাযায় শরীক হয়ে সমবেতভাবে দোয়া করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। তারা নানা-ওযর আপত্তি করে নিজে জানাযায় শরীক হয় না।

অন্যকে নামায পড়তে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন তামাশা দেখে এটা খুবই গর্হিতকাজ।

জানাযার বিভিন্ন মাসয়ালা

১. জানাযার জন্যে জামায়াত শর্ত নয়। একজন জানাযার নামায পড়লে ফরয আদায় হবে। তবে ব্যবস্থাপনার সাথে জানাযায় শরীক হওয়া সকলের উচিত। নবী (সঃ) বলেন যে, জানাযায় শরীক হওয়া মুসলমান মাইয়েতের হক-(মুসলিম)।

২. জানাযা ঐসব মসজিদে মাকরুহ্ যা পাঞ্জেগানা নামাযের জন্যে তৈরী করা হয়েছে। জুমা মসজিদেও মাকরুহ্। তবে যে মসজিদ বিশেষ করে জানাযার নামাযের জন্যে তৈরী করা হয়েছে, সেখানে মাকরুহ্ নয়।

৩. একই সময়ে কয়েকটি জানাযা জমা হলে প্রত্যেকের পৃথক পৃথকও পড়া যায় এবং এক সাথেও পড়া যায় একসাথে পড়তে হলে তার নিয়ম এই যে, প্রত্যক মাইয়েতের মাথা উত্তরে এবং পা দক্ষিণে করে রাখতে হবে। অর্থাৎ কারো

মাথা বা পায়ের দিকে কোন মাইয়েত থাকবে না। তারপর ইমাম পূর্বধারে রাখা মাইয়েতের সিনা বরাবর দাঁড়াবেন। তাহলে সকলের সিনা বরাবর দাঁড়ানো হবে।

৪. যেসব কারণে অন্যান্য নামায নষ্ট হয় সেসব কারণে জানাযার নামায নষ্ট হবে। তবে অট্টহাসিতে জানাযার নামায নষ্ট হয় না অথবা পুরুষের বরাবর অথবা সামনে কোন মেয়েলোক দাঁড়ালেও নামায নষ্ট হবে না।

৫. যদি কোন ব্যক্তি বিলম্বে জানাযায় হাযির হয় যখন ইমাম কিছু তাকবীর বলে ফেলেছেন, তখন সে আসা মাত্রই ইমামের সাথে শামিল হবে না বরঞ্চ পরবর্তী তাকবীরের অপেক্ষা করবে যখন ইমাম তাকবীর বলবেন তখন সে তাকবীর বলে নামাযে শামিল হবে। এ তাকবীর তার তাকবীর তাহরীমা মনে করা হবে। ইমাম সালাম ফিরালে মাসবুকের মতো সে ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো বলে নামায শেষ করবে।

৬. যদি কারো অযু বা গোসলের প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং সে মনে করে যে অযু বা গোসল করতে গেলে জানাযা পাওয়া যাবে না, তাহলে তায়াম্মুম করে জানাযার নামাযে শরীক হওয়া জায়েয হবে। এ জন্য যে, জানাযার কাযা নেই।

৭. জানাযা নামায পড়াবার সবচেয়ে হকদার ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান অথবা তাঁর নিযুক্ত শহরের শাসনকর্তা। তা না হলে শহরের কাযী অথবা তার সহকারী। এসব না থাকলে মহল্লার ইমাম। মহল্লার ইমাম তখন পড়াবেন যখন মাইয়েতের আপনজন কেউ ইমামের চেয়ে ইলম ও তাকওয়ার দিক থেকে উৎকৃষ্টতর না হয়। নতুবা আপনজনই জানাযা পড়বার সবচেয়ে বেশী হকদার। তারপর অলী যাকে অনুমতি দেয় সে পড়াবে।

৮. জানাযার পর পরই মাইয়েত কবরে নিয়ে যাওয়া উচিত।

৯. মাইয়েত ছোট বাচ্চা হলে তাকে হাতে উঠিয়ে কবরে নিয়ে যেতে হবে। এক ব্যক্তি কিছু দূর নেবে অন্য ব্যক্তি কিছু দূর এভাবে পালাক্রমে কবরে নিয়ে যাবে।

১০. মাইয়েত বয়স্ক হলে তাকে খাটিয়াতে করে চারজন চার পায়া ধরে কাঁধে করে নিয়ে যাবে।

১১. কোন ওযর ব্যতীত মাইয়েতকে যানবাহনে করে নেয়া মাকরুহ।

১২. জানাযা একটু দ্রুত কদমে নিয়ে যাওয়া সুন্নাত, তবে এতোটা দ্রুত নয় যে, মাইয়েত ঝাঁকুনি পায়।

১৩. জানাযার পিছনে যাওয়া মুস্তাহাব। সকলের আগে যাওয়া মাকরুহ। কিছু আগে কিছু পেছনে যাওয়া যায়।

১৪. জানাযার সাথে যারা চলবে, জানাযা নামাবার আগে তাদের বসা ঠিক নয়। বিনা ওযরে বসা মাকরুহ।
১৫. জানাযার সাথে পায়ে হেঁটে চলা মুস্তাহাব। যানবাহনে হলে তাকে পেছনে থাকতে হবে।
১৬. জানাযার সাথে চলতে গিয়ে উচ্চস্বরে দোয়া যিকির করা মাকরুহ।
১৭. জানাযার সাথে মেয়েদের যাওয়া মাকরুহ তাহরীমা।

জানাযা কাঁধে নেয়ার নিয়ম

জানাযা উঠিয়ে কাঁধে নেয়ার মুস্তাহাব পদ্ধতি এই যে, সামনের পায়া ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলবে। এমনি প্রত্যেকে দশ কদম পর পর পায়া বদল করবে। এভাবে ৪০ কদম যাবে। হাদীসে আছে যে, যে ব্যক্তি জানাযা কাঁধে করে ৪০ কদম যাবে, তার ৪০টি কবীরা গুনাহ্ মাফ হয়।

দাফনের মাসয়ালা

১. মাইয়েত দাফন করা ফরযে কেফায়া। যেমন গোসল দেয়া। জানাযার নামায পড়া ফরযে কেফায়া।
২. কবরের দৈর্ঘ মাইয়েতের উচ্চতার সমান, গভীরতা তার অর্ধেক। প্রস্ত হাত দুই যাতে মাইয়েতকে রাখতে পারা যায়।
৩. কবরে নামাবার পূর্বে মাইয়েতকে কবরে কিবলার দিকে রাখতে হবে। যারা কবরে নামাবে তারা কিবলামুখী হয়ে নামাবে।
৪. কবরে নামাবার সময় بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ বলা মুস্তাহাব।
৫. মাইয়েত কবরে রেখে ডান কাত করে কিবলামুখী করে দেয়া সুন্নাত।
৬. মাইয়েত মেয়েলোক হলে কবরে নামাবার সময় পর্দা করা মুস্তাহাব। মাইয়েতের শরীর খুলে যাওয়ার আশংকা হলে পর্দা করা ওয়াজিব।
৭. কবরে মাটি দেয়া মাথার দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। প্রত্যেকে দু'হাতে মাটি নিয়ে কবরে ঢালবে। প্রথমবার বলবে مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ দ্বিতীয়বার وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ এবং তৃতীয়বার বলবে وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى
৮. দাফন করার পর কিছুক্ষণ কবরের পাশে থেকে মাইয়েতের জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব।
৯. কবরে মাটি দেয়ার পর কবরে পানি ছিটানো মুস্তাহাব।
১০. কবরে কোন তাজা গাছের ডাল পুঁতে দেয়া মুস্তাহাব। হাদীসে আছে, নবী (সঃ) একবার একটা সবুজ ডাল দু'ভাগ করে দু'টি কবরে পুঁতে দিয়ে বললেন, যতোক্ষণ না এ ডাল শুকানো হবে, ততোক্ষণ কবরে মাইয়েতের আযাব কম হবে।

১১. এক কবরে একটি মাইয়েত দাফন করা উচিত। প্রয়োজন হলে একাধিক করা যায়।

১২. সৌন্দর্যের জন্যে কবরের উপরে দালান-কোঠা, গম্বুজ, মিনারা প্রভৃতি তৈরী করা হারাম।

১৩. সমুদ্র ভ্রমণে কারো মৃত্যু হলে এবং স্থলভূমি বহু দূরে হলে-যেখানে পৌঁছতে পৌছতে লাশ খারাপ হওয়ার আশংকা, এমন অবস্থায় মাইয়েতকো গোসল দিয়ে তার জানাযা করে সমুদ্রের উপর ছেড়ে দিতে হবে। তবে স্থলভূমি নিকটে হলে স্থলে তার কবর দেয়া উচিত।

সান্ত্বনা দান (তা'যিয়াত)

মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনকে ধৈর্য ধারণের উদ্দেশ্যে কিছু সান্ত্বনার বাণী শুনানো, তাদের প্রতি সমবেদনা জানানো, তাদের দুঃখ লাঘব করা এবং মাইয়েতের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করা প্রভৃতিকে ইসলামী পরিভাষায় 'তা'যিয়াত' বলে। নবী (স) স্বয়ং তা করেছেন এবং করার জন্যে তাকীদ করেছেন। তিনি বলেন-

–যে ব্যক্তি কোন বিপন্নের তা'যিয়াত করে, তার জন্য ঐ রূপ প্রতিদান রয়েছে, যেমন স্বয়ং বিপন্নের জন্যে রয়েছে -(তিরমিযী)।

হযরত মাআয (রা) বলেন, তাঁর ছেলের ইন্তেকাল হলে নবী (স) নিম্নোক্ত তা'যিয়াতনামা পাঠানঃ-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে মাআয বিন জাবালের প্রতি-

তোমার উপরে সালাম হোক। আমি প্রথমে তোমার সামনে আল্লাহ্র হামদ ও সানা পড়ছি যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তারপর দোয়া করছি এ শোকে আল্লাহ্ তোমাকে বিরাট প্রতিদান দিন। তোমাকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন। আমাদেরকে এবং তোমাকে তাঁর শোকর আদায় করার তওফীক দিন। আসল কথা এই যে, আমাদের জান-মাল এবং পরিবারবর্গ আল্লাহ্ মুবারকের দান, আর এগুলো আমাদের কাছে তাঁর সোপর্দ করা আমানত। আল্লাহ্র যতোদিন চান এ দানগুলো থেকে আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ দেন। যখন চান তখন এ দান ফেরত নেন। তার পরিবর্তে বিরাট প্রতিদান দেন। অর্থৎ তুমি যদি আল্লাহ্র সন্তুটি ও আখেরাতের প্রতিদানের জন্যে সবর কর, তাহলে তিনি তোমাকে তাঁর খাস রহমত ও হেদায়েত দ্বারা ধন্য করবেন।

অতএব সবর কর, এমন যেন না হয় যে, তোমার শোকে হা হুতাশ করা তোমার প্রতিদান ও সওয়াব বরবাদ করে দেয়, তারপর তুমি অনুতাপ করতে থাকবে। মনে রেখ যে, শোকে কান্নাকাটি করাতে মৃত ব্যক্তি ফিরে আসবে না, না তার দ্বারা শোক-দুঃখ কমে যায়। যে হুকুম নাযিল হয় তা হয়ে থাকে এবং হয়ে গেছে-(মু'জামে কবীর)।

দুই ঈদের নামাযের বিবরণ

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, লোকেরা বছরে দু'টি নির্দিষ্ট দিনে খেলাধুলা ও আনন্দ উপভোগ করে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দু'টি দিন কেমন?

তার বলেন, আমরা ইসলামের আগমনের পূর্বে এ দুটি দিনে খেলা-তামাশা ও আনন্দ উপভোগ করতাম।

নবী (সঃ) বলেন, আল্লাহ্ এ দু'টি দিনের পরিবর্তে দুটি উৎকৃষ্টতর দিন নির্ধারিত করে দিয়েছেন। একটি ঈদুল ফিতরের দিন এবং অন্যটি ঈদুল আযহার দিন।

ঈদুল ফিতরের মর্ম

শওয়াল মাসের প্রথম দিন মুসলমানগণ ঈদুল ফিতর উৎসব পালন করেন। আল্লাহ্ তাআলা বান্দাহদের উপরে রমযান মাসের রোযা, তারাবীহ, কুরআন তেলাওয়াত, দান খয়রাত প্রভৃতি যেসব ইবাদত নির্ধারিত করে দিয়েছেন, বান্দাহগণ তা ভালোভাবে আদায় করার তওফীক তাঁর কাছ থেকে লাভ করে সফলতা লাভ করেছে। তারই জন্য সত্যিকার আনন্দ প্রকাশের জন্যই এই ঈদুল ফিতরের উৎসব পালন করা হয়।

ঈদুল আযহার মর্ম

যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে মুসলমান ঈদুল আযহার উৎসব পালন করেন। এ উৎসব আসলে সেই বিরাট কুরবানীর স্মৃতিবাহক যা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাইল (আ) আল্লাহ্র দরবারে পেশ করেছিলন। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র ইংগিতে তাঁর একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাইল (আ)কে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত হলেন। এদিকে হযরত ইসমাইল (আ) আল্লাহ্র এটাই ইচ্ছা তা জানতে পেরে আনন্দ চিত্তে ধারাল ছুরির নীচে তাঁর গলা রেখে দিলেন। কুরবানির অতুলনীয় ইতিহাস স্মরণে ঈদুল আযহা পালন করে মুসলমানগণ তাদের কথা ও কাজের দ্বারা এ ঘোষণাই করে যে, তাদের কাছে যে জান ও মাল আছে তা আল্লাহ্র ইংগিত মাত্রই আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করবে। তারা পশুর গলায় ছুরি দিয়ে তার রক্ত প্রবাহিত করে আল্লাহ্র কাছে এ শপথ করে, "হে আল্লাহ্! তোমার সন্তুষ্টির জন্য যেভাবে আমরা পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, প্রয়োজন হলে আমাদের রক্তও তোমার পথে প্রবাহিত করতে কুণ্ঠিত হবো না। এ সৌভাগ্য আমাদের হলে আমরা তোমার অনুগত ও বিশ্বস্ত বান্দাহ প্রমানিত হবো।"

ঈদুল ফিতর দিনের সুন্নাত কাজ

১. নিজের সাজ পোশাকের ব্যবস্থা করা।

২. ফজরের নামাযের পর ঈদের নামাযের জন্যে গোসল করা।

৩. মিসওয়াক করা।

৪. সাধ্যমত নতুন বা পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৫. খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা।

৬. ঈদগাহে যাবার আগে সদকা ফেতরা দিয়ে দেয়া।

৭. ঈদগাহে যাবার আগে কিছু মিষ্টি খাওয়া।

৮. ঈদগাহে নামায আদায় করা। ঈদগাহে নামায পড়ার জন্যে যাওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। নবী (সঃ) ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তেন যদিও মসজিদে নববীতে নামায পড়ার অসাধারণ ফযিলত। একবারমাত্র বৃষ্টির জন্য মসজিদে নববীতে তিনি নামায পড়েন-(আবু দাউদ)।

৯. এক পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং অন্য পথ দিয়ে আসা।

১০. রাস্তায় ধীরে ধীরে নিম্নের তাকবীর বলা।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

ঈদুল আযহার দিনে সুন্নাত কাজ

ঈদুল আযহার দিনেও ঐসব কাজ সুন্নাত যা ঈদুল ফিতরের দিনে সুন্নাত।

১. ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যাবার আগে কিছু না খাওয়া সুন্নাত। হযরত বারীদাহ (রা) বলেন, নবী (সঃ) ঈদুল ফিতরের ঈদগাহে যাবার আগে অবশ্যই কিছু খেতেন এবং ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে খেতেন। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ এবং মুসনাদে আহমদে অতিরিক্ত এ কথা আছে যে, তিনি কুরবানীর গোশত খেতেন)।

২. ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যাবার সময় উচ্চস্বরে তাকবীর পড়া সুন্নাত।

ঈদের নামায

ঈদের দিন দু'রাকায়াত নামায পড়া ওয়াজিব। ঈদের নামায সহীহ এবং ওয়াজিব হওয়ার শর্ত তাই যা জুমার নামাযের জন্য। অবশ্য ঈদের নামাযের জন্যে খুতবা শর্ত নয়, অথচ জুমার খুতবা ফরয। ঈদের খুতবা সুন্নাত।

ঈদের নামাযের পদ্ধতি

ঈদের নামাযের নিয়ত করে আল্লাহু আকবার বলতে বলতে কানের গোড়া পর্যন্ত হাত উঠাবে। তারপর হাত বেঁধে সানা পড়তে হবে।

তারপর তিনবার আল্লাহু আকবার বলতে হবে এবং প্রত্যেক বার কানের গোড়া পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে। প্রত্যেক তাকবীরের পর তিনবার সুবহানাল্লাহ পড়ার পরিমাণ সময় থাকতে হবে। তৃতীয় তাকবীরের পর হাত ঝুলিয়ে না রেখে বাঁধতে হবে। তারপর তায়াউয, তাসমিয়া, সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা তার সাথে মিলাবে।

তারপর নিয়ম মত রুকু সিজদার পর দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা ফাতেহা এবং তার সাথে অন্য সূরা পড়বে।

তারপর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তিন তাকবীর বলে হাত ঝুলিয়ে দেবে। অতপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।

ঈদের নামাযের সময়

সূর্য ভালোভাবে উঠার পর যখন উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়বে তখন ঈদের নামাযের সময় শুরু হবে এবং দুপুর পর্যন্ত বাকী থাকে। কিন্তু ঈদের নামায বিলম্বে না পড়া মুস্তাহাব। তবে মাসনূন এই যে, ঈদুল আযহার নামায একটু তাড়াতাড়ি পড়তে হবে এবং ঈদুল ফিতরের নামায তার কিছু পরে।

ঈদের নামাযের মাসয়ালা

১. যদি কেউ ঈদের নামায না পায় তাহলে সে একাকী ঈদের নামায পড়তে পারে না। এ জন্য যে, ঈদের নামাযের জামায়াত শর্ত। এমনিভাবে কেউ ঈদের নামাযে শরীক হলো বটে কিন্তু তার নামায কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে সে আর কাযা পড়তে পারবে না, তার উপর কাযা ওয়াজিবও হবে না। কিছু অন্য লোক তার সাথে শরীক হলে নামায পড়তে পারে।

২. কোন কারণে ঈদুল ফিতরের নামায ঈদের দিন পড়া গেল না, তাহলে দ্বিতীয় দিনে পড়া যায়-আর এ অবস্থা যদি ঈদুল আযহার সময় হয়, তাহলে ১২ই জিলহজ্জ পর্যন্ত পড়া যায়।

৩. বিনা ওযরে ঈদুল আযহার নামায ১২ তারিখ পর্যন্ত পড়া যায় কিন্তু তা মাকরূহ হবে। ঈদুল ফিতরের নামায বিনা ওযরে বিলম্বিত করা একেবারে জায়েয নয়।

৪. ঈদের নামাযের জন্যে আযানও নেই ইকামাতও নেই।

৫. মেয়েদের জন্য[১] এবং যে ব্যক্তি কোন কারণে ঈদের নামায পড়লো না তাদের

---

১. ঈদের নামাযে শিশু এবং মেয়েদের অংশগ্রহণ ঃ

আহলে হাদীসের মতে ঈদের নামাযে মেয়েদের এবং শিশুদের অংশগ্রহণ মসনূন। কেননা, ঈদ ও জুমার মত শায়ায়েরে ইসলামে শামিল। নবী (সঃ) স্বয়ং মেয়েদেরকে এ ব্যাপারে তাকীদ করেছেন যে, তারা যেন ঈদগাহে যায়। হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে হুকুম করেন যে, আমরা যেন কুমারী, যুবতী,পর্দানশীন মেয়েলোক এবং হায়েয অবস্থায় আছে এমন মেয়েলেকদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাই। অবশ্য যারা হায়েয অবস্থায় আছে তারা ঈদগাহে নামাযের স্থান থেকে আলাদা হয়ে বসবে, তাকবীর বলবে এবং মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হবে। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! অনেক মেয়েলোকের চাদর নেই। তারা কিভাবে ঈদগাহে যাবে? নবী (সঃ) বলেন, যার চাদর আছে সে তার চাদরের মধ্যে তার দ্বীনি বোনকে নিয়ে নেবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমীযী) হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ঈদের নামাযে গেলাম। তিনি নামায পড়িয়ে খুতবা দিলেন। তারপর মেয়েদের সমাবেশে গিয়ে তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত করলেন এবং সদকা খয়রাতের জন্য প্রেরণা দিলেন। (বুখারী)

জন্যে ঈদের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া মাকরূহ।

৬. কোন ব্যক্তি এমন সময়ে ঈদের নামাযে শরীক হলো যখন ইমাম তাকবীর বলে কেরায়াত শুরু করেছেন তখন সে নিয়ত বেঁধে প্রথমে তাকবীর বলবে। যদি সে রুকুতে শরীক হয়, তাহলে নিয়ত বেঁধে তসবিহ্ বলার পরিবর্তে তাকবীর বলবে কিন্তু হাত উঠাবে না। পুরা তাকবীর বলার পূর্বে যদি ইমাম রুকু থেকে ওঠে পড়েন, তাহলে সেও ইমামের সাথে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় যে তাকবীর ছুটে যাবে তা মাফ।

৭. ইমাম যদি ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলতে ভুলে যান এবং রুকুতে গিয়ে মনে হয়, তাহলে রুকু অবস্থাতেই তাকবীর বলবেন। কেয়াম করার জন্যে রুকু থেকে উঠলেও নামায নষ্ট হবে না।

৮. ঈদগাহে বা যেখানে ঈদের নামায পড়া হচ্ছে সেখানে অন্য নামায মাকরূহ। ঈদের নামাযের পূর্বেও এবং পরেও।[১]

৯. কেউ ঈদের নামায না পেলে কাযা পড়তে হবে না। কারণ ঈদের নামাযের কাযা নেই।[২]

১০. শহরে কয়েক স্থানে ঈদের নামায সর্ব সম্মতিক্রমে জায়েয। যারা ঈদগাহে যেতে পারে না তাদর জন্য শহরে নামাযের ব্যবস্থা করা উচিত যাতে করে তারা ঈদের নামায আদায় করতে পারে।

১১. ঈদের নামাযে উচ্চস্বরে কিরায়াত পড়তে হবে। যেসব সূরা নবী (সঃ) পড়তেন তা পড়া ভালো। তিনি কখনো সূরা 'আ'লা' এবং 'গাশিয়া' পড়তেন- (আহমদ, তিরমিযী) এবং কখনো সূরা 'কাফ' এবং 'কামার' পড়তেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

তাকবীরে তাশরীক

১. যিলহজ্জ্ব মাসের নয় তারিখে 'ইয়াওমে আরফা' (আরাফাতের দিন) বলে। দশ তারিখকে 'ইয়াওমুন্নাহার' (কুরবানীর দিন) এবং এগারো, বারো এবং তেরো তারিখকে আইয়্যামে তাশরীক বলে। এ পাঁচ দিনে ফরয নামাযের পর যে তাকবীর বলা হয় তাকে তাকবীরে তাশরীক বলে।

---

১. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) ঈদের নামাযের জন্য বেরুলেন। তারপর শুধু দু'রাকায়াত পড়লেন তার আগে এবং পরে কোন নামায পড়লেন না। (তিরমিযী)

২. আহলে হাদীসের মতে, কেউ ঈদের নামায না পেলে একাকী দু'রাকায়াত পড়ে নেবে।

২. তাকবীরে তাশরীক হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

৩. তাকবীরে তাশরীক আরাফার দিনের ফজর থেকে শুরু করে ১৩ই যিলহজ্জের আসর নামায পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়তে হবে। অর্থাৎ তেইশ ওয়াক্ত নামাযের পর তাকবীর পড়া ওয়াজিব।

৪. তাকবীরে তাশরীক উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব। মেয়েরা ধীরে ধীরে পড়বে।

৫. মুসাফির এবং মেয়েদের জন্যে তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু তারা যদি এমন লোকের পেছনে নামায পড়ে যার তাকবীর পড়া ওয়াজিব, তাহলে তাদের পড়াও ওয়াজিব হবে।

৬. তাকবীরে তাশরীক নামায পড়ার পর পরই পড়া উচিত। কিন্তু নামাযের পর যদি এমন কোন কাজ করা হয় যা নামাযে নিষিদ্ধ, যেমন অট্টহাসি করা, কথা বলা, অথবা মসজিদ থেকে বাইরে চলে যাওয়া, তাহলে তাকবীর বলবে না। তবে হ্যাঁ অযু চলে গেলে বিনা অযুতে তাকবীর পড়া জায়েয এবং অযু করার পর পড়াও জায়েয।

৭. ইমাম তাকবীর পড়তে ভুলে গেলে, মুক্তাদীর উচিত সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর শুরু করা। তাহলে ইমামেরও মনে পড়বে। চুপ করে বসে থেকে ইমামের প্রতীক্ষায় থাকা ঠিক নয় যে, ইমাম পড়লে তারপর পড়া হবে।